লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮২ বর্ষ | ১১ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ | ১৭ রবি. সানি, ১৪৪১ হিজরি | ১৫ ফাতাহ্, ১৩৯৮ হি. শা. | ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

Nooruddin Mosque in Darmstadt, Germany

ন্যাশনাল সেক্রেটারীদের উদ্দেশ্যে
আন্তর্জাতিক ওয়াকফে-নও রিফ্রেশার কোর্স-এ
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ দিচ্ছেন

সম্পাদকীয়

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর কল্যাণমণ্ডিত দিকনির্দেশনা

পরিচালনা: সঠিক হয় আদর্শিক উদাহরণ দ্বারা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর কল্যাণমণ্ডিত দিকনির্দেশনায় বিশ্বব্যাপী ওয়াকফেনও সেক্রেটারীদের আন্তর্জাতিক রিফ্রেশার কোর্স গত ৬ ডিসেম্বর শুক্রবার থেকে শুরু হয়ে, ৮ ডিসেম্বর ২০১৯ রবিবার চার দিন পর্যন্ত টিলফোর্ডের ইসলামাবাদস্থ আইওয়ান-ই-মাসরূর হলে অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানসহ ৩৬টি দেশের প্রতিনিধিত্বমুলক অংশগ্রহণে সুসম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্!

পবিত্র কুরআনের সূরা আলে-ইমরানের ৩৬ নম্বর আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে হযরত মরিয়ম (আ.)-এর মা, কন্যা মরিয়মের জন্মের পূর্বে কীভাবে তাঁর সন্তানকে আল্লাহ্‌র সেবায় উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

জামা'তের ভবিষ্যত অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি সুরক্ষার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম আহমদীয়াতের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা বিশ্বব্যাপী সর্বোত্তম উপায়ে পরিবেশন করার জন্য যথাসম্ভব ওয়াকেফিনকে প্রস্তুত করা। আল্লাহ্‌র রহমতে তাদের অনেকেই এখন জামা'তের খেদমত করছেন।

এক্ষেত্রে নিজ নিজ দেশের ওয়াকফে-নও সেক্রেটারীদের ওয়াকীফেনে-নও'দের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক শিক্ষাগত উন্নতির যত্ন নেওয়ার সবিশেষ গুরুত্ব যেমন রয়েছে, তেমনই হযরত আমিরুল মোমিনিন (আই.) ওয়াকফে-নও স্কীমে অংশগ্রহণকারীদেরকে যেসব নির্দেশনা দিয়ে থাকেন, ওয়াকেফীনদের সুস্থ ও সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য যারা দায়বদ্ধ সর্বদা তাদের হুযূর (আই.) প্রদত্ত সেই সব দিকনির্দেশনা যথাস্থানে পৌঁছানো ও কার্যকর করা অবশ্যই উচিত।

ওয়াকফে-নও প্রকল্পের উদ্বোধনের পর থেকে বেশ কয়েকটি দেশে জামেয়া আহমদীয়া খোলা হয়েছে আর এসব জামেয়া থেকে অনেক সংখ্যক ওয়াকফে-নও শিক্ষা গ্রহণ করে ধর্মপ্রচারক তথা মুরুব্বী-মুবাল্লেগ হয়ে জামা'তের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণে সেবা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। বেশকিছু সংখ্যক ওয়াকেফিন জামেয়া থেকে মিশনারি-ধর্মপ্রচারক তথা মুরুব্বী-মুবাল্লেগ হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে প্রতি বছরই বের হচ্ছেন, তবে চিকিৎসক এবং শিক্ষকদের প্রয়োজনীয়তাও গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে।

'ওয়াকফে-নও'-এর সকল কর্মী ও সেক্রেটারীগণ, অন্য যে কোনও কিছুর আগে এ আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হওয়া উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি নিজস্ব ব্যক্তিগত কর্তব্য সম্পাদন করছে। তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা নামাযে নিয়মনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং নফল নামাযের প্রতিও মনোযোগ দিচ্ছেন। সর্বাগ্রে নামায প্রতিষ্ঠিত না রাখলে, কিছুই সম্ভব না। জগতকে আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ করতে হলে নামায কায়েম রাখা এবং কঠোর পরিশ্রম করে যাওয়া; এ দু'টোকে সমন্বিতভাবে পালন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ওয়াকফে-নও'এর সকল সেক্রেটারীদের মনে রাখা উচিত যে, আস্থাপূর্ণ মহান এক দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, আর তা হল ওয়াকেফিনদের বাবা-মা তাদের সন্তানদের ইসলামের সেবার জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে উৎসর্গ করেছেন তা রক্ষার্থে তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও গাইড করা।

সেক্রেটারীরা যদি সত্যিকারের ইসলামিক মূল্যবোধ অনুশীলন করে তবেই তারা সত্যিকার অর্থে তাদের দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে। এই দায়িত্বটি কখনই তাদের হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। ওয়াকফে-নও'কে ধর্মীয় আদর্শে লালন-পালন ও জাগতিক শিক্ষার দিক থেকে নির্দেশনার যোগান দেওয়া সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীদের দায়িত্ব। ওয়াকেফীনকে অবশ্যই তাদের ওয়াক্‌ফ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং 'ওয়াক্‌ফ' উপাধি-সর্বস্ব নয়, বরং এটি একটি দায়বোধ ও দায়িত্ব পালনের এক অঙ্গীকার, একটি আজীবন প্রতিশ্রুতি; যার সমকক্ষতায় কোনও পার্থিব বাধ্যবাধকতার কোনই মূল্য থাকে না।

এই মানগুলি যদি শৈশব থেকেই মানসপটে সন্নিবেশিত হয় তবেই ওয়াকফে-নও'এর সেক্রেটারীরা সফল হতে পারবেন। আর ওয়াকেফীন'ও তখন বুঝতে পারবেন বাস্তবে তারা 'ওয়াকফ-ই-জিন্দেগী' অর্থাৎ ইসলামের সেবায় আজীবন নিবেদিত।

ওয়াকফে-নও সেক্রেটারীদের উচিত ব্যক্তিগত উদাহরণ স্থাপন করা এবং তারা যেসব নির্দেশনা দিয়ে থাকেন তা অনুশীলন করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি, সেক্রেটারীদের অবশ্যই তাদের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা পালন ও প্রতিষ্ঠার জন্য সময় বের করা উচিত এবং পার্থিব আনুষ্ঠানিকতা যেন কখনও তাদেরকে এথেকে বিচ্যুত করতে না পারে। তাহাজ্জুদ, পাঁচ বেলার সালাত, আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রার্থনা এবং তাঁর ক্ষমা যাচনা করা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। ওয়াকেফিনের সার্বিক মঙ্গল কামনায় তাদের নিয়মিত দোয়া করতে থাকা উচিত। এসব কর্তব্য-কর্ম সম্পন্ন হলে সেক্রেটারীরা হয়তো বলতে পারবেন যে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা সকলকে নিজ দায়িত্ব অনুধাবন করে যথাযথ ভাবে তা পালনের তৌফিক দান করুন। আমীন!

সূচিপত্রে

১৫ ডিসেম্বর ২০১৯

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃতবাণী	৫
জার্মানীর গিসেন-এ প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৮ অক্টোবর, ২০১৯ মোতাবেক ১৮ইখা, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র **জুমুআর খুতবা** **মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ**	৬
পশ্চিম থেকে সূর্যোদয় টিলফোর্ড-এর পবিত্র ভূমি ইসলামাবাদ মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্	১৫
ইউরোপে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর মাসাধিককাল ব্যাপী এক সফল সফর মোহাম্মদ ফজলুর রহমান	১৯
দোয়া কবুলিয়াত আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ মাওলানা শরীফ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ্	২২
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা মাওলানা সাব্বির আহমদ, মুরুব্বি সিলসিলাহ্	২৯
মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুর-এর ১৩ তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৯ অনুষ্ঠিত	৩১
সংবাদ	৩৩
শোক সংবাদ	৩৬

পাক্ষিক 'আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন **www.theahmadi.org**

পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–

pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ কাহ্‌ফ-১৮

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَاۤ اَبْرَحُ حَتّٰۤى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا ﴿٦١﴾

৬১। আর (স্মরণ কর) মূসা যখন তার যুবক (সঙ্গী)-কে বললো, 'আমাকে যুগ যুগ ধরে চলতে হলেও দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে[১৭০৪] না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হবো না[১৭০৪-ক]।'

১৭০৪। এই আয়াত দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর 'ইসরা' (আধ্যাত্মিক নৈশভ্রমণ)-এর বিষয় আরম্ভ হয়েছে। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত ঈসা (আ.)-এর শিষ্যরা প্রচুর পার্থিব ক্ষমতা ও উন্নতির অধিকারী হয়েছিল এবং তাদের বৈচিত্রপূর্ণ জীবনের অগ্রগতিতে পৃথিবীর ইতিহাসে দু'বার অমোচনীয় ছাপ ও প্রভাব রেখেছিল। খ্রিষ্টান জাতিসমূহের এই সাফল্য ৩৩ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত 'দু'টি বাগান' এর উপমা দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দু'যুগের প্রথমটির সূচনা হয়েছিল রোম সম্রাট কনষ্ট্যানটাইনের খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে, যখন তা রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকৃত হয়েছিল এবং তা ইসলাম ধর্মের নবী করীম (সা.)-এর জন্মের পূর্ব পর্যন্ত চলেছিল। এই দুই যুগের দ্বিতীয় এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ যুগটি বর্তমান যুগ। এ সময়ে পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান জাতিগুলো এত বেশি ক্ষমতা ও গৌরব অর্জন করেছে যে এশিয়া এবং আফ্রিকার জাতিসমূহ যেন দায়বদ্ধ কৃষক এবং কেনা গোলামের মত তাদের আদেশ ও অনুকম্পার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে। এই "দু'টি বাগান" এর মধ্যবর্তী স্থানে নদীনালা প্রবাহিত (আয়াত-৩৪)। এই নদীনালা ইসলামের জন্ম এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার নিদর্শন জ্ঞাপক যা এই দু'টি যুগের মধ্যবর্তীকালে মানবজাতির ইতিহাসে এক গভীর ছাপ রেখেছিল। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে এবং একে সংযুক্ত ছিদ্রের ন্যায় পরিদৃষ্ট করার জন্য হযরত মূসা (আ.)-এর ইসরা বা আধ্যাত্মিক ভ্রমণ বৃত্তান্তের কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা বর্তমান তফসীরাধীন এবং পরবর্তী কয়েক আয়াতে দেয়া হয়েছে। মূসা (আ.) তাঁর সদৃশ এক নবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮:১৮)। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে কুরআন করীমের ৭৩:১৬ আয়াতে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। খ্রিষ্ট ধর্মের সূচনা এবং এর পরবর্তী উন্নতি ও অগ্রগতি দু'টি যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। গুহাবাসীগণ এবং ইয়া'জূজ-মা'জূজ (গগ এণ্ড ম্যাগগ)-এর আবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়ে মূসা (আ.)-এর আধ্যাত্মিক সফরের কথা বর্ণনার মধ্য দিয়ে কুরআন মজীদ তাঁর (মূসা-আ.) ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত ইসলামের নবী করীম (সা.)-এর আগমনের ঘটনাকে নির্দিষ্ট করেছে, যিনি (সা.) মূসা (আ.)-এর অনুরূপ এবং উক্ত দুই যুগের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর আবির্ভাব হওয়া নির্ধারিত ছিল। এরূপে এ সকল ঘটনাপ্রবাহ এখানে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় উল্লিখিত হয়েছে।

১৭০৪-ক। 'হুকুব' বহুবচন, একবচনে 'হুকবাহ' অর্থ : দীর্ঘকাল, অনির্দিষ্ট কাল, এক যুগ, সত্তর বছর বা ততোধিক সময় (মুফরাদাত, লেইন)।হযরত মূসা (আ.)-এর ইসরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইসরার অনুরূপ ছিল (১৭:২)। এই ভ্রমণ দৈহিক ছিল না, এ ছিল এক আধ্যাত্মিক বা রূহানী অবস্থা, যার মাধ্যমে হযরত মূসা (আ.)-কে রক্তমাংসের দেহ থেকে বিস্মৃত করে গভীর রূহানী মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছিল। বাইবেল এবং কুরআন উভয়ই এই মতের সমর্থন করে। এই সমর্থনের পক্ষে কয়েকটি যুক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হলো : (১) হযরত মূসা (আ.)-এর জীবন সম্পর্কে খ্রিষ্টানরা বাইবেলকে মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য দলীলরূপে মেনে থাকে। (২) আল্লাহ্ তা'লার নবীরূপে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার পূর্বে এবং পরেও মূসা (আ.) মাত্র একটি সফরই করেছিলেন এবং তা মিদিয়ানে। বাইবেল ও কুরআন উভয়ই এই ভ্রমণের প্রতি নির্দেশ করেছে। উভয়ে এই বিষয়ে একমত যে, হযরত মূসা (আ.) কেবল মিদিয়ানের দিকেই ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে যে সফর সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে তাতে উল্লিখিত হয়েছে, এই সফরে মূসা (আ.)-এর সাথে তাঁর তরুণ সঙ্গী ছিল। (৩) পৃথিবীতে 'মাজমাআল বাহরাইন' নামে পরিচিত কোন স্থান নাই। এই কথার অর্থ 'দুই সমুদ্রের সংযোগস্থল।' মূসা (আ.)-এর বাসস্থানের নিকটবর্তী এরূপ সংযোগ হচ্ছে 'বাবুল মান্দাব' যা ভারত মহাসাগর এবং লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করেছে, দার্দানেল প্রণালী যা ভূমধ্যসাগরকে মর্মর সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এবং আল-বাহরাইন যেখানে এসে পারস্য উপসাগর এবং ভারত মহাসাগর মিলিত হয়েছে। এই সকল স্থানের মধ্যে একমাত্র দার্দানেল প্রণালীই এরূপ একটি মিলন কেন্দ্র হওয়া সম্ভব ছিল। কারণ মিশর থেকে গতিপথের মধ্যে কেনান অবস্থিত, যা মূসা (আ.)-এর গন্তব্য স্থান ছিল। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তিনি সেখানে পৌঁছতে সক্ষম হন নি। এই তিনটি কেন্দ্র বা অন্তরীপই হযরত মূসা (আ.)-এর বসতি থেকে প্রায় এক হাজার মাইল দূরত্বে ছিল এবং সেই যুগে যাতায়াতের অসুবিধা এবং যানবাহনের অভাব বিবেচনা করে বলা যায়, এরূপ সুদীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করতে তার বহু মাস সময় লেগে যাওয়ার কথা এবং এমতাবস্থায় হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষে তাঁর শিষ্যদের আধ্যাত্মিক মঙ্গল মারাত্মকভাবে বিপন্ন না করে এত দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকা সম্ভব ছিল না। বিশেষত তাদের সম্পর্কে তার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাদেরকে ছেড়ে মাত্র চল্লিশ দিনের জন্য তূর পর্বতে থাকাকালীন সময়ে। 'মাজমাআল বাহরাইন' শব্দের দ্বারা মনে হয় দুটি বিধানের সংযোগ বা মিলন ক্ষেত্র বুঝাচ্ছে, যথা-মূসায়ী শরীয়ত এবং ইসলামী শরীয়তের সংযোগ বা মিলন ক্ষেত্র।

এ ছাড়া অর্থাৎ এই বাহ্যিক প্রমাণ ছাড়াও অনেক অভ্যন্তরীণ প্রমাণ ৬১-৮৩ নম্বর আয়াতসমূহে রয়েছে যাতে প্রতিপন্ন হয়, মুসা (আ.)-এর সফর দৈহিক বা বাহ্যিক ঘটনা ছিল না বরং আধ্যাত্মিক ছিল। কেননা (ক) রাজা কর্তৃক জবরদখল থেকে রক্ষা করার জন্য সে (সেই বুযূর্গ) নৌকার মধ্যে এক বড় ছিদ্র করে দিলেন (আয়াত ৭২)। কিন্তু ছিদ্র করার পরে কি নৌকাটি চলাচলের উপযোগী ছিল না? উপযোগী থাকলে রাজা তা বাজেয়াপ্ত করলো না কেন? না থাকলে তা ডুবে গেল না কেন? এই জড় জগতে কোন নৌকার তলাতে বিরাট ছিদ্র করে দেয়ার পরে তা ভাসমান থাকতে পারে না। শুধু দিব্যদর্শন বা কাশফের জগতেই এরূপ ব্যাপার সম্ভব। (খ) আল্লাহ্ তা'লার কোন নবী দূরে থাক, সুস্থ মস্তিষ্কের সচেতন ব্যক্তি বৈধ কারণ ছাড়া অপরের প্রাণ নাশ করতে পারে না, যেমনটি সেই বুযূর্গ করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে (আয়াত ৭৫)। (গ) হযরত মূসা (আ.)-এর মত আল্লাহ্ তা'লার এক মহান নবী এবং উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট উদারচেতা ব্যক্তি সেই বুযূর্গের অপরাধ সাব্যস্ত করলেন শুধু এ জন্য যে, তিনি পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র বালক দু'টির ভাঙ্গা দেয়াল মেরামতের জন্য মজুরী দাবি করলেন না, কারণ শহরের লোকেরা তাঁদেরকে আপ্যায়ন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল? এতীম বালক দু'টি মূসা (আ.)-এর অসন্তুষ্টি অর্জনের মত কী করেছিল? বালক দু'টি নয় বরং শহরের লোকেরাই তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করেছিল। (ঘ) এটা কল্পনাও করা যায় না, হযরত মূসা (আ.)-এর মত আল্লাহ্ তা'লার মহান নবীকে কষ্টকর দীর্ঘভ্রমণে বের হতে হয়েছিল শুধুমাত্র এক আল্লাহ্‌র বান্দার সন্ধানে এবং তাঁর নিকট এই শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য যে, কেমন করে ও কী কারণে নৌকার তলায় ছিদ্র করতে হয় বা এক যুবককে হত্যা করতে হয় অথবা কীরূপে দেয়াল মেরামত করে তার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে না হয়।

এ ছাড়া বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, মূসা (আ.) যদি নীরব থাকতেন তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্যের বহু গোপন রহস্য আমাদের নিকট উদঘাটন করে দিতেন (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)। কিন্তু সেই অস্বাভাবিক কাজের মধ্যে তো গায়েবের কোন রহস্য থাকার কথা নয় যা 'আল্লাহ্ তা'লার বান্দা' করেছিলেন বলে কথিত হয়েছে। মাওয়ারদির মতে মূসা (আ.) যে ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন তিনি কোন মানুষ ছিলেন না, আল্লাহ্ তা'লার ফিরিশতা ছিলেন (ইবনে কাসীর)। এই সমস্ত ঘটনা একত্রিত করে বিবেচনা করলে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী প্রমাণ মিলে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সফর কাশফ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না, যার প্রকৃত মর্মার্থ জ্ঞাত হওয়ার জন্য তাবিল বা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন। ৬১ নং আয়াতে 'যুবক সঙ্গী' শব্দটি 'নূন' এর পুত্র যশুয়ার প্রতি ইশারা হতে পারে, কিন্তু তা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি অধিকতর সঙ্গতভাবে প্রযোজ্য। হযরত ঈসা (আ.)-ই ছিলেন হযরত মূসা (আ.)-এর তরুণ সঙ্গী (অনুগামী) যিনি তাঁর বিধানকে (শরীয়তকে) বিনষ্ট করার জন্য নয় বরং পূর্ণ করতে এসেছিলেন (মথি-৫:১৭)। "আমি (যে পথে চলছি সে পথ চলায়) থামবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছি" এই বাক্য প্রকাশ করছে যে, মূসা (আ.)-এর যুবক সঙ্গী তাঁর ভ্রমণের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। সফরের সূচনাতেই তিনি যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে ছিলেন বলে মনে হয় না। মূসা (আ.)-এর আবির্ভাবের ১৪শত বৎসর পরে ঈসা (আ.)-এর আগমন। অন্যথায় 'আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব' এই শব্দগুলো ব্যক্ত করেছে যে, মূসায়ী শরীয়ত বহু শতাব্দী ব্যাপি চালু থাকবে। মূসা (আ.)-এর সময় থেকে আরম্ভ করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত, যখন মূসা (আ.)-এর শরীয়তের কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেল। এই সময়কালের ব্যাপ্তি দুই হাজার বৎসরের উর্ধ্বে।

হাদীস শরীফ

বল প্রয়োগ করে ইসলাম প্রচার করা নিষিদ্ধ

কুরআনঃ

ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই। (কারণ) সৎপথ ও ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে; সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে (পুণ্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বিদ্রোহী শক্তিকে) অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনে সে নিশ্চয় এমন এক সুদৃঢ় হাতলকে মজবুত করে ধরেছে যা কখনও ভাঙ্গবার নয়। *(সূরা বাকারা : ২৫৭)*

হাদীসঃ

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আতফা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, **"হে লোক সকল! শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো না, বরং আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তার প্রার্থনা করো এবং মুকাবেলা হলে ধৈর্য ধারণ করো।"** *(বুখারী-কিতাবুল জিহাদ।)*

হযরত সাঈদ ইবনে আবু বুরদাহ তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম (সা.) হযরত মুয়াজ (রা.) ও হযরত আবু মুসা (রা.)-কে ইয়মেনে প্রেরণের সময় উপদেশ দান করলেন, **"তোমরা লোকদের জন্য সহজসাধ্য কাজ করবে, কষ্টদায়ক কাজ করবে না, আশার বাণী শুনাবে, নৈরাশ্যজনক কথা বলে বীতশ্রদ্ধ করবে না এবং ঐকমত্য সহকারে কাজ করবে; মতানৈক্য সৃষ্টি করবে না।"** *(বুখারী-কিতাবুল জিহাদ)*

কুরআন করীমে পরিষ্কার আদেশ রয়েছে, যে ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে তলোয়ার ধারণ করো না বরং ধর্মের সাক্ষাৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে পেশ কর এবং নেক নমুনা ও উত্তম আদর্শ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট কর।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন– "কুরআন করীমে পরিষ্কার আদেশ রয়েছে, যে ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে তলোয়ার ধারণ করো না বরং ধর্মের সাক্ষাৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে পেশ কর এবং নেক নমুনা ও উত্তম আদর্শ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট কর। এ ধারণা পোষণ করো না যে, শুরুতে ইসলামে তলোয়ার চালাবার আদেশ দেয়া হয়েছিল। কেননা সেই তলোয়ার দীনকে বিস্তার দানের উদ্দেশ্যে চালান হয় নি, বরং শত্রুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করার কিংবা শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই চালানো হয়েছিল। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ করা কখনও উদ্দেশ্য ছিল না।" *(বুখারী-কিতাবুল জিহাদ)*

অমৃতবাণী

হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর মোজেজা সকল নবীর উর্ধ্বে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

আঁ হযরত সালাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালামের অনুরূপ দ্বিতীয় মোজেজা হচ্ছে 'শাক্কুল কমর'-চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করণ। এই অলৌকিক নিদর্শনও প্রদর্শিত হয়েছিল তাঁর (সা.) আধ্যাত্মিক শক্তির বলে। কোন দোয়া ছিল না এর সঙ্গে। কেননা, তা স্রেফ এক অঙ্গুলি ইশারাতেই সংঘটিত হয়েছিল, এবং ঐ অঙ্গুলি ছিল তখন খোদায়ী শক্তিতে ভরপুর। এ রকম বহু মোজেজা প্রদর্শিত হয়েছিল তাঁর (সা.) দ্বারা, যেগুলি সংঘটিত হয়েছিল তাঁর (সা.) নিজের ক্ষমতার বলেই, কোন দোয়া সেগুলির মধ্যে শামিল ছিল না। কয়েকবার সামান্য পরিমাণ পানি, যা একটা মাত্র পেয়ালার মধ্যেই ছিল, তার মধ্যে তাঁর (সা.) আঙ্গুলিগুলি ডুবিয়ে দিয়ে তা পরিমাণে এতো বেশি বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন যে, সেই পানি সেনাবাহিনীর সব লোক, উট, ঘোড়া, পান করার পরেও দেখা গেছে, তা পরিমাণে আগের মতই রয়ে গেছে। কয়েকবার দু'চারটা রুটির ওপরে নিজের হাত রেখে সেই রুটির দ্বারাই হাজারো ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত মানুষকে পেট ভরে খাইয়ে দিয়েছেন। কোন কোন সময় সামান্য পরিমাণ দুধে নিজের ঠোঁট ছুঁইয়ে দিয়ে সেই বরকতে, তা একদল মানুষকে পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছেন। কোন কোন সময় ময়লা পানির কুয়ার মধ্যে নিজের মুখের থু থু ফেলে সেই পানিকে একেবারে পরিষ্কার ও সুপেয় করে দিয়েছেন। আবার কখনো কখনো সাংঘাতিক ভাবে জখমী লোকদের গায়ে হাত রেখে তাদেরকে সুস্থ করে তুলেছেন। অনেক সময় যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রচন্ড আঘাতে কোটর থেকে বেরিয়ে পড়া চক্ষুকে নিজের হাতের বরকতে যথাস্থানে বসিয়ে ভাল করে দিয়েছেন। এইভাবে, তিনি (সা.) এমন এমন অসংখ্য কাজ নিজের ক্ষমতা বলে করেছেন যেগুলির মধ্যে খোদায়ী শক্তি নিহিত ছিল।

আজকের দিনের ব্রাহ্মণরা কিংবা দার্শনিকরা বা প্রকৃতি পূজারীরা যদি এই সকল মোজেজা বা অলৌকিক নিদর্শনকে অস্বীকার করে, তবে তারা তা করতে পারে তাদের অজ্ঞতার কারণে। কেননা, তারা সেই মর্যাদা বা মর্তবাকে সনাক্ত করতে পারে না যার ফলে মানুষ ঐশী ক্ষমতা জিল্লীভাবে বা প্রতিবিম্বাকারে লাভ করতে পারে। যদি তারা এ বিষয়ে হাসি-ঠাট্টাও করে, তবুও তাদেরকে মাফ করা যায়। কেননা, তারা তাদের বাল্যসুলভ অবস্থা থেকে উনড়বতি লাভ করতে পারে নি; তারা কোন প্রকারের কোন আধ্যাত্মিক স্তরেই উনড়বড়বীত হয় নি। তারা তাদের অবস্থা শুধু বিকৃত ও ক্ষতিগ্রস্থই করে নি, বরং তাদের সেই বিকৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থাতে তারা মরতেও খুশী।

কিন্তু, বড়ই আফসোস ঐ সমস্ত খৃষ্টানদের জন্য যারা অনুরূপ, বরং তার চেয়েও নীচু স্তরের। কোন কোন ঘটনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়ার কথা শুনে শুনে সেগুলোকে উলুহিয়াৎ বা ঈশ্বরত্বের প্রমাণ বলে মেনে নিয়েছে, এবং বলে বেড়াচ্ছে যে, মসীহ্ কতৃক মৃতকে জীবিত করা এবং খঞ্জ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করা তাঁর নিজস্ব শক্তির বলেই সাধিত হয়েছিল; এসবের মধ্যে কোন প্রার্থনা ছিল না। এবং এটাই নাকি প্রমাণ যে, তিনি সত্যি সত্যিই খোদার পুত্র ছিলেন, বরং খোদা-ই ছিলেন। কিন্তু, আফসোস যে, এই বেচারাদের কোন খবরই নেই যে, যদি এই সমস্ত কারণেই মানুষ খোদা হয়ে যেতে পারে, তাহলে, ঐ খোদায়ীর চেয়ে অনেক বড় খোদায়ীর অধিকারী হবেন আমাদের নেতা ও প্রভু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। কেননা যে ধরনের অসামান্য অলৌকিক নিদর্শন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দেখিয়েছেন, তা হযরত মসীহ্ আলাইহেস সালাম কোন ক্রমেই কখনই দেখাতে পারেন নি। আমাদের সৎ-পথ প্রদর্শক ও পরিচালকহাদী ও মুক্তাদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই প্রকারের ঘটনাবলী, না শুধু নিজেই সংঘটিত করে দেখিয়েছেন, বরং তার একটা ধারাবাহিকতা রোজ কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতের মধ্যে জারি করে দিয়ে গেছেন, যা কিনা সর্বদা এবং প্রত্যেক যামানায় সেই যামানার প্রয়োজন মোতাবেক প্রকাশিত হয়ে এসেছে। এবং তা এই দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত একই ভাবে প্রকাশিত হতে থাকবে। খোদায়ী শক্তির চাপ ও প্রভাব এই উম্মতের পবিত্র আত্মাসমূহের উপরে যত তীব্রভাবে পতিত হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত অপর কোন উম্মতের মধ্যে পাওয়া যায় না। এটা কত বড় নির্বুদ্ধিতা যে, এই জাতীয় অলৌকিক ঘটনার জন্যই এক ব্যক্তিকে খোদা অথবা খোদার বেটা বলে চিহ্নিত করা হবে? যদি এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনাবলীর কারণেই মানুষ খোদা হয়ে যায়, তাহলে তো খোদার সংখ্যার কোন সীমাপরিসীমাই থাকবে না।

(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃ: ৬৫-৬৭)

জার্মানীর গিসেন-এ প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৮ অক্টোবর, ২০১৯ মোতাবেক ১৮ইখা, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র

জুমুআর খুতবা

মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ

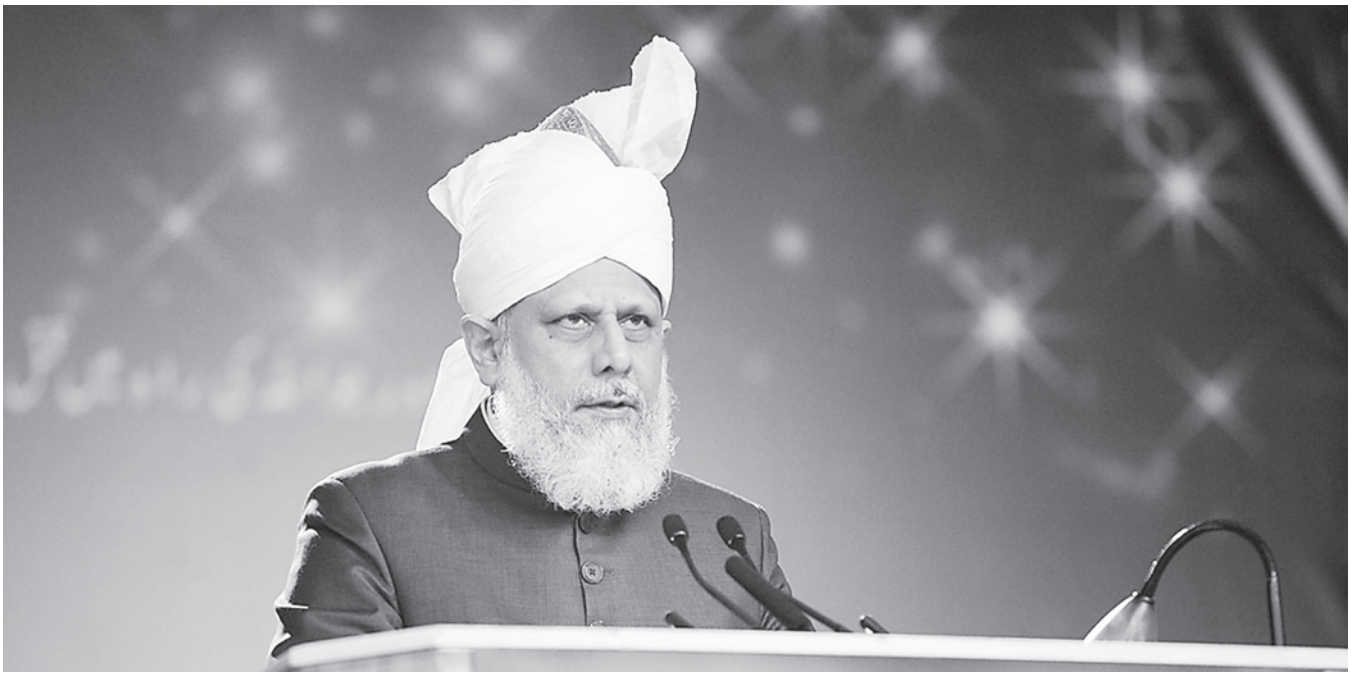

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজকে আমি যেসব বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে সর্বপ্রথম নাম হলো হযরত হোসাইন বিন হারেস (রা.)। হযরত হোসাইনের মা ছিলেন সুখায়লা বিনতে খুযাঈ। তিনি ছিলেন বনু মুত্তালেব বিন আবদে মানাফ গোত্রের সদস্য। তিনি তার দুই ভাই হযরত তোফায়েল এবং হযরত উবায়দার সাথে মদীনায় হিজরত করেন। তাদের সাথে হযরত মিসতা বিন উসাসা (রা.) এবং হযরত আব্বাদ বিন মুত্তালিব (রা.)ও ছিলেন। মদীনায় তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালামা আজলানী (রা.)-এর বাড়িতে অবস্থান করেন। রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.)-এর সাথে হযরত হোসাইন (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। এটি মুহাম্মদ বিন ইসহাকের ভাষ্য। হযরত হোসাইন বদর এবং ওহুদসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত হোসাইন (রা.)-এর দুই সহোদর হযরত উবায়দা (রা.) এবং হযরত তোফায়েল (রা.)ও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত হোসাইন এর মৃত্যু হয়েছে ৩২ হিজরীতে। *(আত্তাবাকুতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০ 'হোসাইন বিন হারেস' দারু এহইয়ায়ুত তারাসুল আরাবি, বৈরুতে মুদ্রিত ১৯৯৬) (আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪১, 'উবায়দা বিন হারেস' দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুতে মুদ্রিত ২০০২) (উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৩, ' হোসাইন ইবনুল হারেস', দারুল কুতুল ইলমিয়া, বৈরুত)*

হযরত হোসাইন (রা.)-এর পুত্রের নাম ছিল আব্দুল্লাহ্। তার দুই কন্যা ছিলেন- খাদিজা এবং হিন্দ আর তারাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। খায়বারের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) তাদের উভয়কে ১০০ 'ওসাক' খাদ্যশস্য প্রদান করেছিলেন। *(আত্তাবাকুতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০ 'যিকরুল হোসাইন বিন হারেস'; ৮ম খণ্ড, পৃ.*

৩৬৪, তাসমিয়াতুন নিসায়ুল মাবায়াত মিন কুরাইশিন, দারু আহইয়ায়ুত তারাসুল আরাবি, বৈরুতে মুদ্রিত ১৯৯৬)

এক 'ওসাক' ৬০ 'সা'-এর সমান হয়ে থাকে আর এক 'সা' আড়াই সের-এর সমপরিমাণ বা কিছুটা কম হয়ে থাকে। অতএব এভাবে তাদের পিতার কারণে মহানবী (সা.) তাদেরকে প্রায় ৩৭৫ মন খাদ্যশস্য প্রদান করেছিলেন। *(লুগাতুল হাদীস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৭, 'ওসাক'; ২য় খণ্ড পৃ. ৬৪৮ 'সা' নাশের নো'মানী কুতুবখানা লাহোর ২০০৫)*

হযরত সাফওয়ান (রা.), তার পিতার নাম ছিল ওহাব বিন রাবিআ। ইনি হলেন দ্বিতীয় সাহাবী যার আমি স্মৃতিচারণ করব। হযরত সাফওয়ানের ডাকনাম ছিল আবু আমর। তিনি বনু হারেস বিন ফেহের গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল ওহাব বিন রাবিআ। অপর একটি রেওয়ায়েতে তার নাম ওহায়েবও বর্ণিত হয়েছে। তার মায়ের নাম ছিল দাআদ বিনতে জাহ্‌দাম, যিনি বায়যা নামে পরিচিত ছিলেন। এ কারণেই হযরত সাফওয়ান (রা.)কে ইবনে বায়যাও বলা হতো। তিনি হযরত সাহাল (রা.) এবং সোহায়েল (রা.)-এর ভাই ছিলেন। মহানবী (সা.) যে সাহাল (রা.) এবং সোহায়েল (রা.)-এর কাছ থেকে মসজিদে নববীর ভূমি ক্রয় করেছিলেন তারা এই দুই ভাই নন। তারা ছিলেন অন্য দুজন ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত রাফে বিন মুআল্লা (রা.)–এর সাথে হযরত সাফওয়ান (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। অন্য আরেকটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত সাফওয়ান (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা হয়েছিল হযরত রাফে বিন আজলান (রা.) সাথে। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কেও ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলে যে, বদরের যুদ্ধে তোআয়মা বিন আদী হযরত সাফওয়ান (রা.)কে শহীদ করেছিল কিন্তু অন্য আরেকটি রেওয়ায়েত অনুসারে তিনি বদরের যুদ্ধে শহীদ হন নি, বরং তিনি বদরের যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত সাফওয়ান (রা.) সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে এসেছে যে, বদরের যুদ্ধের পর তিনি মক্কা ফিরে গিয়েছিলেন। কিছুকাল পর তিনি পুনরায় মদীনায় হিজরত করে চলে আসেন। মক্কা বিজয় পর্যন্ত তিনি মক্কায়ই অবস্থান করেছেন বলেও রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাকে আব্দুল্লাহ্ বিন জাহশা (রা.)-এর যুদ্ধাভিযানে অন্তর্ভুক্ত করে 'আবওয়া' অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে তার মৃত্যুর সন ১৮বা ৩০ কিংবা ৩৮ হিজরী উল্লেখ করা হয়েছে। *(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩, 'সাফওয়ান বিন ওহাব', দারুল কুতুল ইলমিয়া, বৈরুত) (আল ইসবা ফি তামযীযিস সাহাবা, সাহাবা ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯, সাফওয়ান বিন ওহাব, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুতে মুদ্রিত ১৯৯৫) (আত্তাবাকুতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮ 'সাফওয়ান বিন বায়যা' দারুল কুতুল ইলমিয়া, বৈরুতে মুদ্রিত ১৯৯০)*

যাহোক, সব ক্ষেত্রেই এটি প্রমাণিত যে, তিনি (রা.) বদরী সাহাবী ছিলেন।

পরবর্তী সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের (রা.)। হযরত মুবাশ্বের (রা.)-এর পিতার নাম ছিল আব্দুল মুনযের আর তাঁর মাতার নাম ছিল নসীবা বিনতে যায়েদ। তিনি অউস গোত্রের বনু আমর বিন অউফ শাখার সদস্য ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের (রা.) এবং হযরত আকেল বিন আবু বুকায়ের (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি (সা.) হযরত আকেল বিন আবু বুকায়ের (রা.) এবং হযরত মুজাযযার বিন যিয়াদ (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। যাহোক তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর সেই যুদ্ধেই তিনি শাহাদত বরণ করেন। হযরত মুবাশ্বের (রা.)-এর ভাই এবং হযরত আবু লুবাবা (রা.)-এর পুত্র হযরত সায়েব বিন আবু লুবাবা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) গনিমতের মালে হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের (রা.)-এর অংশ নির্ধারণ করেন আর মাআন বিন আদী (রা.) তার অংশ আমাদের কাছে নিয়ে আসেন। *(আত্তাবাকুতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৭-২৪৮, মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের, দারু এহইয়ায়ুত তারাসুল আরাবি, বৈরুতে মুদ্রিত ১৯৯৬)*

অর্থাৎ তাঁর ভাই এবং ভ্রাতুষ্পুত্ররাও অংশ পেয়েছে।

মদীনায় হিজরতের সময় মুহাজেরদের মধ্য থেকে হযরত আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ (রা.), হযরত আমের বিন রাবিআ (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.) এবং তাঁর ভাই হযরত আবু আহমদ বিন জাহাশ (রা.) কুবায় হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের (রা.) বাড়িতে অবস্থান করেন। এরপর মুহাজেরগণ একের পর এক সেখানে আসতে থাকেন। *(আস্ সীরাতুন্নাবুওয়্যা লে ইবনে হিশাম, পৃ. ৩৩৫, যিকরুল মুহাযিরীন ইলাল মাদীনাতে, দারুল ইলমিয়া, বৈরুতে মুদ্রিত ২০০১)*

হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের (রা.) তাঁর দুই ভাই হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযের (রা.) এবং হযরত রিফা বিন আব্দুল মুনযের (রা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত রিফা (রা.) ৭০জন আনসারের সাথে আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। একইভাবে বদর এবং ওহুদের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি (রা.) ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা সময় মহানবী (সা.) হযরত আবু লুবাবা (রা.)কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে রওহা নামক স্থান থেকে ফেরত পাঠান। যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে রওহা মদীনা থেকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। কিন্তু মহানবী (সা.) তার জন্য গনিমতের মাল এবং পুণ্যে অংশ নির্ধারণ করেছেন। আল্লামা ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের (রা.) বনু আমর বিন অউফ গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি সেসব আনসারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন। *(উসদুল গাবা*

ফি মা'রেফাতিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, মুবাশ্বের বিন আব্দিল মুনযের, পৃ. ৫৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ২০০৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আত্তাবাকুতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪১ মুবাশ্বের বিন আব্দিল মুনযের, দারু এহইয়ায়ুত তারাসুল আরাবি, ১৯৯৬সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (লুগাতুল হাদীস, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম (রা.) বর্ণনা করেন, ওহুদের যুদ্ধের পূর্বে আমি স্বপ্ন দেখলাম, হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের (রা.) আমাকে বলছেন, কিছুদিনের মধ্যেই তুমি আমাদের কাছে চলে আসবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোথায়? তিনি বললেন, আমি জান্নাতে। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা পানাহার করি। তখন আমি তাকে বললাম, আপনি কি বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন নি? তিনি বললেন, হ্যা! কেন নয়? কিন্তু আমাকে পুনর্জীবিত করা হয়েছে। এই সাহাবী মহানবী (সা.)-কে এই স্বপ্নের কথা শুনালে তিনি (সা.) বলেন, হে আবু জাবের! শাহাদত এমনই হয়ে থাকে। *(আল মুস্তাদরেক আলাস্ সাহীহায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪০-১৮৪১, কিতাব মা'রেফাতুস সাহাবা, যিকরু মানাকেবে আব্দিল্লাহিবনে আমর, মাকতুবা নাযারা মোস্তফা আল বায, মক্কা ২০০০)*

(অর্থাৎ) একজন শহীদ আল্লাহ্‌র কাছে যায় এবং সেখানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে।

আল্লামা যারকানি বদরের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী সাহাবীদের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, অওস গোত্রের দু'জন সাহাবী ছিলেন, যাদের একজন ছিলেন হযরত সা'দ বিন খায়সামা (রা.)। কেউ কেউ বলে, তুআয়মা বিন আদী তাকে শহীদ করেছে আবার কারো কারো মতে, আমর বিন আবদে উদ্দ তাকে শহীদ করেছিল। সামহুদী তার বই 'ওফা'-তে লিখেছেন যে, জীবনিগ্রন্থ রচয়িতাদের লেখা থেকে স্পষ্ট যে, হযরত উবায়দা (রা.) ছাড়া বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীরা বদরেই সমাহিত রয়েছেন। হযরত উবায়দা (রা.)'র মৃত্যু কিছুকাল পর হয়েছিল আর তিনি 'সাফরা' বা 'রওহা' নামক স্থানে সমাহিত রয়েছেন।

তিবরানী নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, "নিশ্চয় মহানবী (সা.)-এর সেসব সাহাবী, বদরের যুদ্ধে যাদের শহীদ করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের আত্মাকে জান্নাতে সবুজ পাখিদের মাঝে স্থান দেবেন, তারা জান্নাতে পানাহার করবে। এমতাবস্থায় তাদের প্রভু তাদের সামনে অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করবেন এবং বলবেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কী চাও? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! এর চেয়েও মহান কিছু আছে কী? আমরা তো জান্নাতে এসে গেছি। আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কী প্রত্যাশা কর? প্রত্যুত্তরে চতুর্থবার সাহাবীরা বলবেন, তুমি আমাদের আত্মাকে আমাদের দেহে ফিরিয়ে দাও, যেন আমাদেরকে পুনরায় সেভাবেই শহীদ করা হয় যেভাবে পূর্বে আমাদের শহীদ করা হয়েছিল।" *(বৈরুত থেকে ১৯৯৬ সনে প্রকাশিত শরাহ্ আল্লামা যারকানী, ২য় খণ্ড পৃ: ৩২৭)*

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল, হযরত ওরাকাহ্ বিন ইয়াস (রা.)। হযরত ওরাকাহ্ (রা.)'র নাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তার নাম ওরাকাহ্ ছাড়া 'ওয়াদফাহ্' এবং 'ওয়াদকাহ্'-ও বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওরাকাহ্ (রা.)'র পিতার নাম ছিল, ইয়াস বিন আমর। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু লাওযান বিন গানাম শাখার সদস্য ছিলেন। আল্লামা ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুসারে হযরত ওরাকাহ্ (রা.) তার দু'ভাই হযরত 'রবী' এবং হযরত 'আমর' এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের তৌফিক লাভ করেছিলেন। হযরত ওরাকাহ্ (রা.) বদরের যুদ্ধ ছাড়াও ওহুদ, খন্দক এবং অন্যান্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে একাদশ হিজরীতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। *(বৈরুত থেকে ২০০১ সনে প্রকাশিত সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬৯) (বৈরুত থেকে ২০০৮ সনে প্রকাশিত আসদুল গাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪১২-৪১৩)*

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হল, হযরত মুহরেয বিন নাযলাহ্ (রা.)। নাযলাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ হলেন তার পিতা। যদিও অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী তার পিতার নাম ছিল ওহাব। তার ডাকনাম ছিল আবু নাযলাহ্। তিনি ফর্সা এবং সুশ্রী চেহারার অধিকারী ছিলেন। তার উপাধি ছিল ফুহায়রা। তিনি আখরাম নামেও সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বনু আবদে শামস এর মিত্র ছিলেন। যদিও বনু আব্দুল আশহাল তাকে নিজেদের মিত্র বলে দাবী করে। অর্থাৎ মুহরেয অথবা আখরাম, দু'টি নামই তার ছিল।

হযরত মুহরেয (রা.) মক্কার বনু গানাম বিন দূদান গোত্রের সদস্য ছিলেন। এই গোত্রটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। এর পুরুষ এবং মহিলারা মদিনায় হিজরতের তৌফিক লাভ করে। এই মুহাজেরদের মাঝে হযরত মুহরেয বিন নাযলাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ওয়াক্‌দী বলেন, আমি ইব্রাহীম বিন ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি যে, ইয়াওমুস্ সারহা-য়, এটি যী কারদ এবং গাবা'র যুদ্ধের নাম, যা ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল, হযরত মুহরেয বিন নাযলা (রা.) ব্যাতিরেকে বনু আব্দিল আশহাল এর ঘর থেকে আর কেউ বের হয়নি। তিনি হযরত মুহাম্মদ বিন মুসলেমা (রা.)-এর ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন, যার নাম ছিল 'যুল্ লাম্মা'। মহানবী (সা.) হযরত মুহরেয বিন নাযলা (রা.) এবং হযরত উমারা বিন হায্‌ম (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। ওয়াক্‌দী-র মতে তিনি বদর, উহুদ এবং পরিখার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সালেহ্ বিন কায়সান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুহরেয বিন নাযলা (রা.) বলেন, আমি স্বপ্নে নিম্ন-আকাশকে দেখি যে, তা আমার জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। এক পর্যায়ে আমি তাতে প্রবেশ করি আর সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যাই। এরপর সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত চলে যাই। আমাকে বলা হয়, এটি হলো তোমার গন্তব্য। হযরত মুহরেয (রা.) বলেন, আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কাছে এই স্বপ্ন বর্ণনা করি, যিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তখন তিনি বলেন, শাহাদাতের শুভসংবাদ গ্রহণ কর! এরপর একদিন তাকে (রা.) শহীদ করা হয়। তিনি মহানবী (সা.) এর সাথে ইয়ামুস সারহা-য় গাবা'র যুদ্ধের জন্য যাত্রা করেন।

এটিকে যী কার্‌দ-এর যুদ্ধও বলা হতো, যা ষষ্ঠ হিজরী সনে সংঘটিত হয়। আমর বিন উসমান জাহ্‌শী নিজ পিতৃপুরুষদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত মুহরেয বিন নাযলা (রা.) যখন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তখন তার বয়স ৩১ বা ৩২ বছর ছিল, আর তিনি যখন শহীদ হন তখন তার বয়স প্রায় ৩৭ বা ৩৮ বছরের কাছাকাছি ছিল। *(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, খণ্ড: ০৩, পৃ: ৫২, মুহরেয বিন নাযলা, দ্বার আহইয়াউত্ তুরাছ, বৈরুত থেকে ১৯৯৬ সনে প্রকাশিত সংস্করণ) (উসদুল গাবা ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবা, খণ্ড: ০৫, পৃ: ৬৮, মুহরেয বিন নাযলা, দ্বারুল কুতুবুল আলামিয়্যা, বৈরুত, লেবানন থেকে ২০০৮ সনে প্রকাশিত সংস্করণ)*

হযরত মুহরেয (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আয়াস বিন সালামা (রা.) যী কার্‌দ এর যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনার পর আমরা মদিনায় ফিরে যাওয়ার জন্য যাত্রা করি। অতঃপর আমরা এক স্থানে যাত্রাবিরতি দেই। আমাদের এবং বনু লেহইয়ান এর মাঝে একটি পাহাড় ছিল। তারা মুশরিক ছিল। এরপর মহানবী (সা.) সেই ব্যক্তির জন্য দোয়া করেন যে রাতে এই পাহাড়ে চড়বে, অর্থাৎ সে যেন মহানবী (সা.) এবং সাহাবীদের জন্য পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং সুরক্ষার উদ্দেশ্যে গুপ্তচরের কাজ করে। মোটকথা নিগরানী ও নিরাপত্তার জন্য যেন ওপড়ে চড়ে আর দৃষ্টি রাখে যে, কোথাও শত্রুরা হামলা না করে বসে। হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.) বলেন, আমি সেই রাতে দুই বা তিনবার পাহাড়ে চড়ি। এরপর আমরা মদিনায় পৌঁছি। তিনি বলেন, এরপর মহানবী (সা.) রাবাহ্ নামের ব্যক্তির হাতে নিজের উট প্রেরণ করেন, যে মহানবী (সা.) এর দাস ছিল। আর আমি হযরত তালহার ঘোড়া নিয়ে তাতে চড়ে বের হই। আমি সেটিকে উটের সাথে পানি পান করানোর জন্য যাচ্ছিলাম। সকাল হলে আব্দুর রহমান ফাযারি মহানবী (সা.) এর উটের ওপর আক্রমণ করে। তার সাথে একটি শত্রু গোত্র ছিল। তারা সব উট হাকিয়ে নিয়ে যায় এবং সেগুলোর রাখালকে হত্যা করে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম- হে রাবাহ্! এই ঘোড়া নাও আর এটিকে তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্'র কাছে পৌঁছে দাও। আর মহানবী (সা.)-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছাও যে, মুশরিকরা আপনার পশু লুট করে নিয়ে গেছে। এরপর আমি মদিনার দিকে মুখ করে একটি টিলার ওপর দাঁড়াই আর তিনবার ডাকি- ইয়া সাবাহাহ্! ইয়া সাবাহাহ্! এই বাক্য আরবরা তখন বলতো যখন কোন ছিনতাইকারী ও হত্যাকারী শত্রু সকালে আসতো। তখন (মানুষ) উক্ত শব্দে নারাহ্ উত্তোলন করতো যেন উচ্চ স্বরে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে এবং সহযোগিতার জন্য ঘোষণা করা হচ্ছে, যাতে নিজ পক্ষের লোকেরা তৎক্ষণাৎ এসে শত্রুর মোকাবিলা করে আর তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়।

কেউ কেউ বলেছেন, যোদ্ধাদের রীতি ছিল, রাত হতেই তারা যুদ্ধ বন্ধ করে দিত এবং নিজেদের ঠিকানায় ফিরে যেত, সাবাহাহ্ সম্পর্কে এটিও আরেকটি রেওয়ায়েত, আর সাবাহাহ্ বলে পরের দিন যোদ্ধাদের অবহিত করা হতো যে, সকাল হয়ে গেছে, অতএব পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। লুগাতুল হাদীস গ্রন্থে এই ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। যাহোক, তিনি বলেন, এরপর আমি তাদের পিছনে সন্ধান করতে করতে এবং তাদেরকে তির মারতে মারতে বের হই, আর আমি রণসঙ্গীত পাঠ করছিলাম এবং বলছিলাম যে,

আনা ইবনুল আকওয়া, ওয়াল ইয়াওমু ইয়াওমুর্ রুয্‌যা

অর্থাৎ আমি আকওয়ার পুত্র আর এই দিনটি হীন ব্যক্তিদের ধ্বংসের দিন। অতএব আমি তাদের মাঝ থেকে যাকেই পেতাম তার হাওদায় তির মারতাম, এমনকি তিরের ফলা বের হয়ে তার কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে যেত। আমি বলতাম, এই নাও, আনা ইবনুল আকওয়া, ওয়াল ইয়াওমু ইয়াওমুর রুয্‌যা। অর্থাৎ আমি আকওয়ার পুত্র আর এই দিনটি হীন ব্যক্তিদের ধ্বংসের দিন। তিনি বলেন, খোদার কসম! আমি তাদের তির মারতে থাকি এবং তাদের আহত করতে থাকি। আর যখন আমার দিকে কোন অশ্বারোহী আসতো তখন আমি কোন গাছের ছায়ায় এসে তার নীচে বসে পড়তাম, অর্থাৎ গাছের পিছনে লুকিয়ে পড়তাম। আর আমি তাকে তির মেরে আহত করে দিতাম। এমনকি যখন পাহাড়ী পথ সরু হয়ে যায় আর তারা সেই সরু পথে প্রবেশ করে তখন আমি পাহাড়ে আরোহন করি আর তাদের দিকে পাথর ছুঁড়তে থাকি। অর্থাৎ এরা যারা মহানবী (সা.)-এর পশুপাল লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের ওপর তিনি আক্রমণ করেন। তিনি একা ছিলেন। প্রথমে তিনি তির মারতে থাকেন, এরপর বলেন যে, গিরিপথে পৌঁছে সেখান থেকে পাথর নিক্ষেপ আরম্ভ করি। এভাবেই আমি তাদের পিছু ধাওয়া করতে থাকি, এমনকি আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর উটগুলোর মাঝ থেকে এমন কোন উট রাখেন নি যেটিকে আমি নিজের পেছনে না ফেলে দেই, অর্থাৎ গিরিপথের কারণে সেগুলো পেছনে রয়ে যায় আর তারা দৌড়ে সামনে চলে যায়। তারা সেগুলোকে আমার ও তাদের মাঝখানে ছেড়ে দেয়। এরপর আমি তির নিক্ষেপ অব্যাহত রাখি। এমনকি তারা ত্রিশটির অধিক চাদর এবং ত্রিশটি বর্শা ওজন হালকা করার উদ্দেশ্যে ফেলে দেয়। অর্থাৎ তারা যেহেতু দৌড়াচ্ছিল তাই উট ছেড়ে দিয়েছিল এবং এরপর নিজেদের জিনিসপত্রও পেছনে ফেলে দিতে আরম্ভ করে যেন সহজে দৌড়াতে পারে। তিনি বলেন, তারা যে জিনিসই ফেলে যেতো, আমি সেগুলোর ওপর চিহ্ন হিসেবে পাথর রেখে দিতাম যেন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা তা চিনতে পারেন। এমনকি তারা একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় পৌঁছে, যেখানে তারা বদর ফাযারি'র কোন পুত্রকে পায়। তারা সেখানে বসে খাদ্য গ্রহণ আরম্ভ করে আর আমি একটি চূড়ায় বসেছিলাম। ফাযারি বলে যে, এই ব্যক্তি কে, যাকে আমি দেখতে পাচ্ছি? তারা বলে, এই ব্যক্তি আমাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। খোদার কসম! সে সকাল থেকে অনবরত আমাদের ওপর তির নিক্ষেপ করে যাচ্ছে, এমনকি সে আমাদের কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নিয়েছে। সে বলে যে, তোমাদের মাঝ

থেকে চার ব্যক্তির তার দিকে যাওয়া উচিত। হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.) বলেন, তাদের মাঝ থেকে চারজন আমার উদ্দেশ্যে পাহাড়ে চড়ে। তারা যখন আমার এতটা নিকটবর্তী হয় যে, আমি তাদের সাথে কথা বলতে পারি তখন আমি তাদের বলি, তোমরা কি আমার সম্পর্কে জান? তারা বলে যে, না, তুমি কে? আমি বললাম যে, আমি সালামা বিন আকওয়া। এরপর তিনি সেই কাফেরদের বলেন যে, তাঁর কসম, যিনি মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র চেহারাকে সম্মানিত করেছেন, আমি তোমাদের মাঝ থেকে যাকে ইচ্ছা ধরতে পারি, কিন্তু তোমাদের মাঝ থেকে কেউ যদি আমাকে পাকড়াও করতে চায় তাহলে সে তা করতে পারবে না। এতে যে চারজন এসেছিল তাদের একজন কিছুটা ভয় পেয়ে যায় এবং বলে যে, আমারও একই ধারণা। এরপর তারা চারজনই ফিরে যায় আর আমি আমার নিজের স্থানে বসে থাকি। এমনকি আমি মহানবী (সা.) এর ঘোড়াগুলোকে গাছপালার মাঝ দিয়ে আসতে দেখি।

তাদের মাঝে সর্বপ্রথম ছিলেন আখরাম আসাদী আর তার পিছনে ছিলেন আবু কাতাদা আনসারী (রা.)। আর তার পিছনে ছিলেন মিকদাদ বিন আসওয়াদ কিন্দি (রা.)। আমি আখরাম অর্থাৎ হযরত মুহরেয (রা.)-এর ঘোড়ার লাগাম ধরি। তখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চতুর্দিকে পালিয়ে যায়। এখানে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে। আমার মনে হয়, সেখানে বসে অন্য যারা খাবার খাচ্ছিল, যখন তারা দেখে যে, তিনি আরো নিকটবর্তী হয়ে গেছেন তখন তারাও পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আখরাম, অর্থাৎ মুহরেযকে বলেন যে, যতক্ষণ মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ পৌঁছে না যান না পৌঁছেন, তুমি আত্মরক্ষা কর যেন তারা তোমাকে ধ্বংস না করে দেয় হত্যা না করতে পারে। তিনি বলেন, হে সালমা! যদি তুমি আল্লাহ্ তা'লা এবং শেষ দিবসে ঈমান রাখ আর তুমি জান যে, জান্নাত সত্য এবং অগ্নি অর্থাৎ জাহান্নাম সত্য, তুমি যদি জান্নাত, অগ্নি তথা জাহান্নাম সত্য বলে জানো, তাহলে তুমি আমার এবং শাহাদতের মাঝে প্রতিবন্ধক হইও হয়ো না। অতএব আমি তাকে ছেড়ে দেই। এমনকি তিনি অর্থাৎ আখরাম (রা.) এবং আব্দুর রহমান পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তিনি আব্দুর রহমানসহ তার ঘোড়াকে আহত করেন। আব্দুর রহমান তাকে অর্থাৎ আখরাম বা হযরত মুহরেয (রা.)-কে বর্শা মেরে শহীদ করে দেয় এবং তার ঘোড়ায় আরোহন করে নিজ লোকদের মাঝে ফিরে যেতে উদ্যত হয়। তখন মহানবী (সা.) এর সাথে যারা আসছিল তাদের মাঝ থেকে একজন অর্থাৎ মহানবীর দক্ষ অশ্বারোহী আবু কাতাদা (রা.) আব্দুর রহমানের পিছু ধাওয়া করেন, এবং তাকে ধরে ফেলেন আর বর্শা মেরে তাকে হত্যা করেন। এ ব্যক্তি হযরত মুহরেয (রা.)-কে শহীদ করেছিল। তিনি বলেন, তাঁর সেই মহান সত্তার কসম যিনি মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র চেহারাকে সম্মানিত করেছেন! আমি দৌড়ানো অবস্থায় তাদের পিছু ধাওয়া করতে থাকি আর তাদের পিছুধাওয়া অব্যাহত রাখি। এমনকি আমি মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবীদের মাঝ থেকে কাউকে বরং তাদের ধূলাকেও নিজের পিছনে দেখতে পাই। অর্থাৎ তিনি অনেক দূর চলে যান অনেকটা অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি সূর্যাস্তের পূর্বে তারা একটি উপত্যকায় পৌঁছে যেখানে একটি ঝর্ণা ছিল। সেটিকে যী কার্দ বলা হতো। অর্থাৎ সেসব লোক, যারা মাল লুটপাট ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা সেখান থেকে পানি পান করতে চাচ্ছিল এবং কেননা তারা পিপাসার্ত ছিল। এরপর তারা আমাকে তাদের পেছনে দৌড়াতে দেখতে পায়। আমি তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেই এবং তারা সেখান থেকে এক ফোঁটাও পান করতে পারে নি। তারা সেখান থেকে বের হয়ে অপর একটি উপত্যকার দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। আমিও দৌড় দেই পশ্চাদ্ধাবন করি। আমি তাদের মাঝ থেকে যাকেই পিছনে পেতাম, অর্থাৎ লুকিয়ে লুকিয়ে পেছনে দৌড়াতে থাকি। আর যে-ই পেছনে রয়ে যেত তার কাঁধের হাড়ে তির মারতাম। আমি বলতাম, এই নাও, আনা ইবনুল আকওয়া', ওয়াল ইয়াওমু ইয়াওমুর রুয্‌যা'।

অর্থাৎ আমি আকওয়ার পুত্র আর এ দিনটি নীচ বা হীন ব্যক্তিদের ধ্বংসের দিন। তিনি বলেন, সে বলে যে, আকওয়া লাঞ্ছিত হোক, সকালের আকওয়ার কথা বলছো? অর্থাৎ তিনি যাদেরকে আহত করছিলেন তাদের মাঝ থেকে একজন বলে যে, সেই সকালের প্রভাতের আকওয়া যে সকাল প্রভাতকাল থেকে আমাদের পিছু ধাওয়া করছে? আমি বললাম যে, হ্যাঁ, হে নিজ প্রাণের শত্রু! তোমার সেই সকালের প্রভাতের আকওয়া। তারা দুটি ঘোড়া উপত্যকায় নিজেদের পেছনে ছেড়ে যায়। আমি সেগুলোকে হাকিয়ে মহানবী (সা.) এর কাছে যাওয়ার জন্য যাত্রা করি। আমি আমেরকে একটি পানির মশকে কিছুটা পানি মিশ্রিত দুধ এবং একটি মশকে পানি নিয়ে আসতে দেখি। আমি ওযু করি এবং পান করি। অতঃপর আমি মহানবী (সা.) এর কাছে আসি, আর তিনি (সা.) তখন সেই ঝর্ণার কাছে ছিলেন যেখান থেকে আমি সকালে তাদের অর্থাৎ সেই ছিনতাইকারীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। মহানবী (সা.) সেই পানির কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমি দেখলাম যে, মহানবী (সা.) সেই উট এবং সমস্ত জিনিস যা আমি মুশরেকদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলাম, হস্তগত গ্রহণ করেছেন। হযরত বেলাল আমি যেসব উট তাদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলাম হযরত বেলাল (রা.) সেই উটগুলোর মাঝ থেকে একটি উটনী জবাই করেন। তিনি মহানবী (সা.) এর জন্য কলিজা এবং কুঁজের মাংস নিয়ে ভুনা করছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে সৈন্যবাহিনী থেকে অর্থাৎ যারা আপনার সাথে এসেছে তাদের মধ্য থেকে ১০০ লোককে নির্বাচন মনোনীত করার অনুমতি দিন। তাহলে আমি তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদের সবাইকে হত্যা করব করতে চাই, যেন তাদের গোত্রকে অবহিত করার মতো কোন লোকও একজনও জীবিত না থাকে। অর্থাৎ যারা এই মালামাল লুটপাট বা ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের কথা হচ্ছে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) খিলখিলিয়ে হাসেন। এমনকি আগুনের আলোয় তাঁর (সা.) দাঁত মোবারক দেখা যেতে থাকে। তিনি (সা.) বলেন, হে সালামা! তুমি কি মনে কর যে,

তুমি এটি করতে পারবে আর তাদের সবাইকে তাদের ঘরে পৌঁছার পূর্বেই হত্যা করতে পারবে? আমি বললাম যে, হ্যাঁ, তাঁর সেই মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, এখন তারা গাতফান এর সীমানায় পৌঁছে গিয়েছে গেছে। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, এখানে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যে, হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে মুশরিকদের দ্বিতীয়বার পিছু ধাওয়া করার অনুমতি চাইলে মহানবী (সা.) বলেন, ইয়া ইবনাল আকওয়া, মালাকতা ফাসজে'। অর্থাৎ হে আকওয়ার পুত্র! তুমি যখন বিজয় লাভ করেছ, যেতে দাও এবং উপেক্ষা কর। এখন তাদের পিছু ধাওয়া করে এবং হত্যা করে কী লাভ? অতএব এই হলো উন্নত আদর্শ। প্রথমে তিনি একা যুদ্ধ করতে থাকেন, হযরত মুহরেয আসলে তার ওপর তারা গুপ্ত-হামলা করে এবং তাকে শহীদ করে। প্রথমে কোনভাবে তিনি তাদের ঘোড়াকে ধরে ফেলেন আর হামলা প্রতিহত করেন এবং বেঁচে যান। কিন্তু পুনরায় আক্রমণ হয় আর তিনি শহীদ হন। এটি হলো তার অর্থাৎ হযরত মুহরেয (রা.)-এর শাহাদতের ঘটনা। আর দ্বিতীয় বিষয় ছিল তার বীরত্ব। এছাড়া রণকৌশল সম্পর্কেও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। অতি দক্ষতার সাথে ছিনতাইকারীদের কাছ থেকে সমস্ত মাল পুনরুদ্ধার করেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো ধনসম্পদ পুনরুদ্ধার করার পরও যখন তিনি বলেন যে, আমি পিছুধাওয়া করে তাদের সবাইকে হত্যা করব; তখন মহানবী (সা.) বলেন যে, তাদেরকে যেতে দাও। সম্পদ যেহেতু ফেরত পাওয়া গেছে তাই ছেড়ে দাও। অতএব এই হলো মহানবী (সা.) এর উন্নত আদর্শ, কেননা হত্যা বা খুন করা তাঁর (সা.) উদ্দেশ্য ছিল না। ছিনতাইকারী এবং আক্রমণকারীদের কাছ থেকে যখন তিনি সম্পদ পুনরুদ্ধার করেন আর তাদের সবাই নিজেদের সবকিছু ছেড়ে পালিয়ে যায়, তখন তাদের কেউ কেউ আহতও হয়, কিন্তু তিনি সেখানে কোন প্রকার যুদ্ধ, খুন বা হত্যা করেন নি যুদ্ধবিগ্রহ বা খুনখারাবি করেন নি। যাহোক তিনি বলেন, মহানবী (সা.) যখন তাকে এসব কথা বলছিলেন যে, ছেড়ে দাও, যেতে দাও, তারা পালিয়ে গেছে, তখন বনি গাতফান এর এক ব্যক্তি আসে এবং বলে যে, অমুক ব্যক্তি তাদের জন্য উট জবাই করেছে। যখন সে উটের চামড়া ছাড়াচ্ছিল তখন সে ধূলা দেখতে পায় এবং বলে যে, তারা এসে গেছে। এরপর তারা সেখান থেকেও পালিয়ে যায়। প্রভাতে মহানবী (সা.) বলেন, আজ আমাদের সর্বোত্তম অশ্বারোহী হলেন আবু কাতাদা, আর পদাতিক সৈনিকদের মাঝে সর্বোত্তম হলেন সালামা। অর্থাৎ পদাতিক যোদ্ধাদের মাঝে সর্বোত্তম হলেন সালামা (রা.), যিনি তাদেরকে কঠিন পরিস্থিতির মাঝে ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে দুটি অংশ দান করেছেন। একটি আরোহীর অপরটি পদাতিকের। এরপর মদিনা ফেরার পথে মহানবী (সা.) আমাকে আসবা উটনীর ওপর নিজের পেছনে বসান। তিনি বলেন, আমরা যখন যাচ্ছিলাম তখন আনসারের এক ব্যক্তি, যার চেয়ে দ্রুত কেউ দৌড়াতে পারত না, তিনি বলতে আরম্ভ করেন যে, মদিনা পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার কেউ আছে কি? যুদ্ধ এবং শত্রুদের নির্যাতন সত্ত্বেও সাহাবীরা নিজেদের বিনোদনের ব্যবস্থাও করে নিতেন। একে অপরকে হালকা চ্যালেঞ্জও করতেন যেন সময়ও কেটে যায় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে যে, স্থায়ী মানসিক চাপ থাকে তা-ও কিছুটা প্রশমিত হয়। যাহোক তিনি বলেন যে, কেউ আছে কি যে আমার সাথে দৌড়বে? এমন কোন দৌড়বিদ আছে কি? তিনি বলেন, তিনি বারবার এই কথার পুনরাবৃত্তি করেন। আমি যখন এ কথা শুনি তখন আমি সেই দ্বিতীয় সাহাবীকে রসিকতা করে বলি যে, তুমি কি কোন সম্মানিত ব্যক্তির সম্মান কর না, কোন বুযুর্গকে ভয় কর না? সে বলে যে, মহানবী (সা.) ব্যতিরেকে আর কাউকে নয়। অর্থাৎ মহানবী (সা.) ছাড়া আর কাউকে আমি ভয় করি না।

আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত। আমাকে এই ব্যক্তির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতে দিন। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, তুমি যদি চাও তাহলে কর। তখন আমি সেই ব্যক্তিকে বলি, চল প্রতিযোগিতা করি। তিনি বলেন, এরপর আমি আমার পা ঘুরিয়ে লাফ দেই এবং দৌড় আরম্ভ করি। আমি এক বা দুই উপত্যকা তার পিছনে দৌড়াই। আমি নিজের শক্তি সঞ্চিত রাখছিলাম। এরপর আমি ধীরে ধীরে তার পিছনে দৌড়াতে থাকি। অতঃপর আমি গতি কিছুটা বাড়িয়ে দেই এবং তার কাছে পৌঁছে যাই। এভাবে দৌড় চলতে থাকে। দৌড়ের ক্ষেত্রে সে ছিল মদিনায় সবার চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন মানুষ ছিল। তিনি বলেন, আমি গতি আরো কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে ধরে ফেলি এবং তার কাঁধের মাঝামাঝি ঘুষি দেই। আমি বলি, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি পেছনে রয়ে গেলে।

এক বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, আমি মদিনা পর্যন্ত তার সামনে ছিলাম। এরপর আমরা শুধুমাত্র তিন রাত এখানে সেখানে অবস্থান করি। অতঃপর মহানবী (সা.) এর সাথে খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। *(সহীহ মুসলিম, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২২৮-২৩৮, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ৩৩৫৮, ২০০৮ সনে নূর ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাজি, বাব গাজওয়া যাতিল কারদ, হাদীস নং ৪১৯৪)* অর্থাৎ সেখানে অবস্থানের পর খায়বারের উদ্দেশ্যে বের হন।

তাবরী'র ইতিহাসে এই যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আসেম বিন আমর বিন কাতাদা কর্তৃক থেকে বর্ণিত যে, যী কারদ এর যুদ্ধে শত্রুদের কাছে সবার আগে হযরত মুহরেয বিন নাযলার ঘোড়া পৌঁছে, যিনি বনু আসাদ বিন হুযায়মা গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত মুহরেয বিন নাযলা (রা.)কে আখরামও বলা হতো। অনুরূপভাবে তাকে (রা.) কুমায়েরও বলা হতো। শত্রুদের পক্ষ থেকে যখন লুটপাট এবং বিপদের আশঙ্কায় সাহাবীদের একত্রিত হওয়ার ঘোষণা আসে তখন হযরত মাহমুদ বিন মাসলামা (রা.)-এর ঘোড়া, যা তার বাগানে বাঁধা ছিল, অন্যান্য ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি অর্থাৎ ডাক শুনতে

পায় এবং নিজের জায়গায় লাফালাফি আরম্ভ করে। এটি একটি উৎকৃষ্ট এবং প্রশিক্ষিত ঘোড়া ছিল। তখন বনু আব্দুল আশআল এর মহিলাদের মাঝ থেকে কতিপয় মহিলা এই বাঁধা ঘোড়াকে এভাবে লাফাতে দেখে হযরত মুহরেয বিন নাযলাকে বলে যে, হে কুমায়ের! আপনার কি নিজের এই ঘোড়ায় আরোহনের সামর্থ্য আছে? আর এই ঘোড়া কেমন তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। এরপর তিনি গিয়ে মুসলমানদের এবং মহানবী (সা.) এর সাথে গিয়ে মিলিত হন। তিনি বলেন, হ্যাঁ আমি প্রস্তুত আছি। এরপর মহিলারা সেই ঘোড়াটি তার (রা.) হাতে সোপর্দ করে। তিনি (রা.) অর্থাৎ হযরত মুহরেয তাতে আরোহন করে যাত্রা করেন। তিনি এই ঘোড়ার লাগাম ঢিল ছেড়ে দেন। এমনকি তিনি সেই দলের সাথে মিলিত হন যা মহানবী (সা.) এর সাথে যাচ্ছিল এবং তিনি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে যান। এরপর হযরত মুহরেয বিন নাযলা বলেন, হে ছোট্ট দল! থাম, যতক্ষণ না অন্যান্য মুহাজের এবং আনসার তোমাদের সাথে মিলিত হয়, যারা তোমাদের পিছনে রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, শত্রুদের এক ব্যক্তি তার ওপর আক্রমণ করে এবং তাকে শহীদ করে। এরপর সেই ঘোড়া অনিয়ন্ত্রিত হয়ে ছুটতে থাকে এবং কেউ সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। এমনকি সেটি বনু আব্দুল আশআল এর মহল্লায় এসে সেই রশির কাছেই দাঁড়িয়ে যায় যা দিয়ে সেটিকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। অতএব সেদিন তিনি ছাড়া মুসলমানদের আর কেউ শহীদ হয় নি। আর হযরত মাহমুদ (রা.) সহীহ্ মুসলিমের [তাবকাত ইবনে সাদ এর বর্ণনা অনুযায়ী সেই সাহাবীর নাম ছিল হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)।] আর তার ঘোড়ার নাম ছিল যুল লাম্মা'। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মুহরেয বিন নাযলা শাহাদতের সময় হযরত উকাশা বিন মিহসান (রা.) এর ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন, সেই ঘোড়াকে জানাহ্ বলা হতো, এবং শত্রুদের কাছ থেকে কিছু পশু ছাড়িয়ে এনেছিলেন। মহানবী (সা.) নিজের স্থান থেকে যাত্রা করেন এবং যী কার্‌দ এর পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে বিরতি দেন। সেখানেই অন্য সাহাবীরা মহানবী (সা.) এর কাছে এসে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) এক দিন এবং এক রাত সেখানে অবস্থান করেন। সালামা বিন আকওয়া (রা.) মহানবী (সা.) কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যদি একশত ব্যক্তিকে আমার সাথে প্রেরণ করেন তাহলে আমি বাকি পশুগুলোও শত্রুদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনছি এবং তাদের ঘাঁড় চেপে ধরছি। মহানবী (সা.) বলেন, কোথায় যাবে? এখন তো তারা গাতফান এর মদ পান করছে। মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদেরকে প্রতি দলে এক এক শ' করে বিভিন্ন দলে ভাগ করে তাদের মাঝে খাবারের জন্য উট বণ্টন করেন, যেগুলোকে সাহাবীরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। এরপর মহানবী (সা.) মদিনায় ফিরে আসেন। *(তারিখুল তিবরী, ৩য় খণ্ড, গাজওয়া যি কারদ, পৃ. ১১৫-১১৬, ২০০২ সনে প্রকাশিত) (আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭০, মুহরেয বিন নাযলাহ, ১৯৯০ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

আর তাদের কাছ থেকে কোন ধরণের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তাদেরকে ছেড়ে দেন বা তাদেরকে যেতে দেন। সেখানে কেবল হযরত মুহরেয (রা.)ই শহীদ হন। এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি অশ্বারোহীদের মাঝে সর্বপ্রথম শহীদ ছিলেন। আর প্রথম বর্ণনায়ও এ কথা-ই বলা হয়েছে।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো, হযরত সোয়াইবিত বিন সা'দ (রা.)। তাকে (রা.) সোয়াইবিত বিন হারমালাও বলা হয়। তার নাম সোয়াইত বিন হারমালা এবং সালীত বিন হারমালাও বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত সোয়াইবিত (রা.) ছিলেন বনু আবদে দার গোত্রের সদস্য। তাঁর মায়ের নাম ছিল হুনায়দা। তিনি প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অধিকাংশ জীবনী লেখকগণ তাকে (রা.) ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। *(উসদুলগাবা ফী মা'রেফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৪, সোয়াইবিত বিন হারমালা, ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আল ইসাবাহ ফী তামযীযিস সাহাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৬৮, নুয়ায়মান বিন আমর, ২০০৫ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (তারিখে দামেস্ক আল কাবীর লে ইবনে আসকার, ১২তম খণ্ডের ২৪তম অংশ, পৃ. ১১৭, বৈরুতে মুদ্রিত)*

হযরত সোয়াইবিত (রা.) মদিনায় হিজরত করেন আর হিজরতের পর তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন সালামা আজলানী (রা.)এর গৃহে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত সোয়াইবিত (রা.) এবং হযরত আয়েয বিন মায়েস (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছেন। হযরত সোয়াইবিত (রা.) বদর এবং ওহুদের যুদ্ধেও যোগদান করেছিলেন। *(আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৫, সোয়াইবিত বিন সা'দ, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

হযরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের এক বছর পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.) সিরিয়ার একটি অঞ্চল 'বুসরা'য় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। তার সাথে নুয়ায়মান (রা.) এবং সোয়াইবিত বিন হারমালা (রা.)ও সফর করেন আর তাদের উভয়েই বদরের যুদ্ধেও যোগদান করেছিলেন। নুয়ায়মান (রা.) পাথেয় বা রসদের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। সোয়াইবিত (রা.) রসিক প্রকৃতির ছিলেন। তিনি নুয়ায়মান (রা.)-কে বলেন, আমাকে খাবার খাওয়াও, রশদ বা খাদ্য সামগ্রী ছিল নুয়ায়মানের তত্ত্বধানে, কাফেলার পুরো খাবার-দাবার আয়োজনের দায়িত্ব ছিল তার ওপর। সোয়াইবিত (রা.) তাকে বলেন, খাবার খাওয়াও। এতে তিনি বলেন, আবু বকর (রা.) যতক্ষণ না আসবেন, আমি খাবার দেবো না। তিনি তখন সুওয়াইবিত (রা.) বলেন, তুমি আমাকে খাবার না দিলে আমি তোমাকে ক্রোধান্বিত করব ক্ষেপাব। [হুযূর (আই.) বলেন] পূর্বেও আমি সংক্ষেপে এই ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম। যাত্রাকালে তারা যখন একটি গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হযরত সোয়াইবিত (রা.) তাদেরকে বলেন, তোমরা কি আমার কাছ থেকে আমার এক কৃতদাসকে ক্রয় করবে? তারা উত্তরে বলে, হ্যাঁ। সোয়াইবিত (রা.) সেই গোত্রের লোকদের বলেন, স্মরণ রেখ! এই কৃতদাস বেশি কথা বলে, আর সে একথাই বলতে থাকবে যে, আমি স্বাধীন। সে তোমাদেরকে এই কথা বললে তাকে ছেড়ে

দিয়ে আমার ব্যবসা খারাপ করো না। তারা উত্তর দেয় যে, না, বরং আমরা তাকে তোমার কাছ থেকে কিনতে চাই। তখন তারা দশ উটের বিনিময়ে সেই কৃতদাসকে কিনে নেয়। এরপর তারা হযরত নুয়ায়মান এর কাছে আসে এবং তার গলায় পাগড়ি বা রশি পরায়। নুয়ায়মান বলেন, এই ব্যক্তি তোমাদের সাথে ঠাট্টা করছে। আমি স্বাধীন, কৃতদাস নই। কিন্তু তারা উত্তর দেয় যে, সে তোমার সম্পর্কে পূর্বেই আমাদের বলে দিয়েছিল যে, তুমি আমাদেরকে একথাই বলবে, এরপর তারা (তাকে) ধরে নিয়ে যায়। হযরত আবু বকর (রা.) যখন ফিরে আসেন আর লোকেরা তার সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন তখন তিনি ঐ লোকদের পেছনে পেছনে যান আর তাদেরকে তাদের উটগুলো ফেরত দিয়ে নুয়ায়মানকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন, আর বলেন, ইনি অর্থাৎ নুয়ায়মান কৃতদাস নন বরং স্বাধীন, উনি অর্থাৎ সোয়াইবিত ঠাট্টা করেছিল। সাহাবীদের মধ্যে এ ধরনের হাসি-ঠাট্টার রীতিও ছিল। যাহোক, এরা যখন ফিরে এসে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় এবং তাঁকে (সা.) এ ঘটনা বলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা এক বছর পর্যন্ত এ ঘটনা উপভোগ করেন। *(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব, বাব আল মাজা, হাদীস নং ৩৭১৯) (মু'জামুল বিলদান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২২, বৈরুতে মুদ্রিত)*

এ কথা শুনে মহানবী (সা.)-ও খুব হাসেন। এক বছর পর্যন্ত এই কৌতুকটি জনপ্রিয় ছিল। যাহোক, একটি ব্যতিক্রমসহ উপরোক্ত ঘটনা কোন কোন গ্রন্থে এভাবেও বর্ণিত হয়েছে যে, দেখা যায়, বিভিন্ন গ্রন্থে লেখা আছে যে, বিক্রেতা হযরত সোআয়বিত নন বরং হযরত নোয়ায়মান ছিলেন।

সাহাবীদের স্মৃতিচারণের পর আমি সংক্ষেপে বলতে চাই তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি এলহাম "ওয়াস্‌সে মাকানাকা" (অর্থাৎ তুমি তোমার গৃহ সম্প্রসারিত কর) সম্পর্কিত সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। এই এলহাম বিভিন্ন সময়ে তাঁর (আ.) প্রতি হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, শুরুতে আল্লাহ্ তা'লা "ওয়াস্‌সে মাকানাকা"র এলহাম সেই সময় করেন যখন সম্ভবত দুই-তিনজন লোকই আমার বৈঠকে আসতো, এছাড়া কেউ আমাতে জানতো চিনতো না। *(সিরাজে মুনীর, রূহানী খাযায়েন ১২শ খণ্ড, পৃ. ৭৩)*

এরপর বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য এলহামের সাথেও "ওয়াস্‌সে মাকানাকা" এলহামটি হতে থাকে। অর্থাৎ নিজের গৃহ বা আবাসন সম্প্রসারণ কর। এর সাথে অন্যান্য যে এলহাম হয়েছে তাতে বিভিন্ন সুসংবাদ এবং বিভিন্নভাবে আল্লাহ্‌র কৃপারাজি বর্ষিত হওয়ারও উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা যখন নিজ নবীদের এলহামের মাধ্যমে কোন নির্দেশ প্রদান করেন যে, এটি কর, তখন এর অর্থ হয় আল্লাহ্ তা'লা এর জন্য সাহায্য ও সহযোগিতাও করবেন আর উপকরণেরও ব্যবস্থা করবেন, এভাবে একাজ সম্পন্ন হবে আর এটিই আমাদের অভিজ্ঞতা। জামা'তের ইতিহাস আমাদের বলে যে, কত মহিমার সাথে আল্লাহ্ তা'লা এই এলহাম পূর্ণ করেছেন আর এখনও পূর্ণ করছেন। আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তুচ্ছ দাস, আমাদেরকেও বিভিন্ন সময়ে এই এলহাম পূর্ণ হওয়ার দৃশ্য দেখিয়ে চলেছেন যাচ্ছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিটি এলহাম এবং কোন বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক তাঁকে নির্দেশ প্রদান অথবা ভবিষ্যদ্বাণীর আদলে কোন কিছু অবহিত করা মূলত তাঁর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের প্রচার এবং উন্নতির সুসংবাদ আর তাঁর তিরোধানের পর খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর বাণীকে বিশ্বময় বিস্তারের সুসংবাদ বটে। অতএব অগ্রপানে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ অথবা যে উন্নতি আমরা দেখি তা মূলত আল্লাহ্ তা'লার সেই পরিকল্পনারই অংশ যা আল্লাহ্ তা'লা জগৎময় ইসলামের প্রচারের জন্য হাতে নিয়েছেন।

এই ভূমিকার পর আমি পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এলহাম "ওয়াস্‌সে মাকানাকা" (অর্থাৎ তুমি তোমার গৃহকে সম্প্রসারিত কর)-এর দিকে আসছি। এখানে অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে খিলাফতের হিজরতের পর, যুক্তরাজ্যে, ইউরোপে, আমেরিকায়, আফ্রিকায় এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে জামা'তের প্রসারের পাশাপাশি জামাতের কেন্দ্র ও স্থাপনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গা প্রদান করতে থাকেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে যখন এখানে হিজরত করে এসেছিলেন তখন আল্লাহ্ তা'লা তাৎক্ষণিক ও অসাধারণভাবে স্বীয় সাহায্যের প্রাচুর্যের নিদর্শন দেখান আর জামা'ত ইসলামাদে ২৫ একর জমি ক্রয় করার তৌফিক লাভ করে। এরপর এতে আরো ৬ একর যুক্ত হয়, যেখানে (দীর্ঘদিন) জলসাও হতে থাকে আর জামা'তের কর্মচারী এবং ওয়াকেফীনদের জন্য কিছু বাসস্থানেরও সুবিধা ছিল। খলীফাতুল মসীহ্‌র থাকার বাসস্থানের জন্য একটি বাংলোও ছিল, কয়েকটি অফিসও ছিল। ব্যারাকরূপী একটি জায়গা ছিল যেখানে মসজিদও বানানো হয়েছিল। আমার স্মরণ আছে, একবার ১৯৮৫ সনে আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আমাকে বিশেষভাবে বলেছিলেন যে, "কেন্দ্রের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে খুবই চমৎকার একটি জায়গা দান করেছেন"। হুবহু এই বাক্য না হলেও মোটামুটি শব্দমালা এমনই ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং অন্যান্য কিছু স্বাক্ষ্যপ্রমাণও এর সত্যায়ন প্রতিয়মান করে যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র এখানে যথারীতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প ছিল। যাহোক, প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। এখন আল্লাহ্ তা'লা ইসলামাবাদে নতুন নির্মাণ কাজের স্থাপনা নির্মাণের তৌফিক দিয়েছেন। উত্তম

সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত কয়েকটি অফিস বানানো হয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক আনুষ্ঠানিক বা রীতিমত মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। যুগ খলীফার জন্য বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে। ওয়াকেফে যিন্দেগী ও কর্মচারীদের জন্যও কিছু গৃহ নির্মিত হয়েছে, আরও কিছু নির্মিত হবে।

লণ্ডনে বাসগৃহ অফিসে রূপান্তরিত করে সাময়িকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল আর খুবই ছোট্ট ছোট ছোট কক্ষে কষ্টে-সৃষ্টে কাজ হচ্ছিল। কাজের বিস্তৃতির ব্যাপকতার কারণে জায়গা খুবই ছোট হয়ে যায় সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া কাউন্সিলও আপত্তি করতো যে, এসব গৃহ আবাসনের জন্য বানানো হয়েছে অথচ তোমরা অফিস বানিয়ে রেখেছ, এখান থেকে অফিস তুলে দাও। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রায়শঃ বিভিন্ন সময়ে সচরাচর এ ধরনের আওয়াজ উত্থিত হতো। এখন এই নতুন স্থাপনা নির্মাণের ফলে এখানে (অর্থাৎ, লণ্ডনে/মসজিদ ফযলের পাশে) বিভিন্ন বাড়িতে যে তিন-চারটি অফিস ছিল তা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হবে। অনুরূপভাবে ইসলাবাদের পাশেই ফার্ণহামে একটি বেশ বড় দ্বিতল বিল্ডিংও আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে দান করেছেন যা ইসলামাবাদ থেকে ২/৩ মাইল দূরত্বে অবিস্থত, সেখানে প্রেস কাজ করছে, এছাড়া কয়েকটি অফিসও রয়েছে। এছাড়া এখানে খোদ্দামুল আহমদীয়াও বড় একটি বিল্ডিং ক্রয় করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। সেই সাথে ইতিপূর্বে জলসাগাহের জন্য (ইসলামাবাদের) অদূরে দু'শতাধিক একরের হাদীকাতুল মাহদী ক্রয় করারও আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিয়েছেন। এরপর লন্ডনে যে জামেয়া ছিল তা-ও এখান থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে আর জামেয়ার বর্তমান জায়গা অকল্পনীয় কম মূল্যে এবং উত্তম পরিবেশে ও উন্নত সুযোগ-সুবিধাসজ্জিত অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন। এ ভূমির মোট আয়তন হলো, প্রায় ৩০ একর। এসব জায়গা ইসলামাবাদ থেকে ১০ থেকে ২০ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত। ইসলামাবাদের বর্তমান প্রকল্পের সাথে এসব জায়গা ক্রয় করার কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। এসবই আল্লাহ্ তা'লার পরিকল্পনা বা অভিপ্রায় ছিল। এই সকল জায়গা, এক এলাকায় কাছাকাছি, একত্র হতে থাকে আর আল্লাহ্ তা'লা কেন্দ্রের পাশাপাশি অন্যান্য জায়গাগুলোরও জিনিসেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জামেয়াও (কেন্দ্রের) নিকটে থাকা আবশ্যক। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা এসব জায়গা, এসব স্থাপনার এক এলাকায় একত্রিত হওয়া সকল অর্থে কল্যাণময় করুন।

আমি যেমনটি বলেছি, যুগ খলীফার বাসস্থান এবং অফিসও সেখানে ইতিমধ্যে নির্মিত হয়েছে। বড় মসজিদও নির্মিত হয়েছে। তাই এখন আমিও লণ্ডন থেকে কয়েকদিনের মধ্যে ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হবো, ইনশআল্লাহু তা'লা। সেখানে স্থানাতন্তর পরবর্তী অবস্থানও যেন সবদিক থেকে কল্যাণময় হয় সেজন্য দোয়া করুন। দোয়া করুন স্থানান্তরের পর সেখানে অবস্থানও যেন সবদিক থেকে কল্যাণময় হয়। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা কৃপা করুন অনুগ্রহরাজী বর্ষণ করতে থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা ইসলামাবাদ থেকে ইসলামের প্রচারের কাজকে পূর্বের তুলনায় আরো ব্যপকতা দান করুন। "ওয়াসসে মাকানাকা" কেবল গৃহায়নের ক্ষেত্রে বিস্তৃতির কারণ যেন না হয় বরং আল্লাহ্ তা'লার বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও যেন প্রসারতার মাধ্যম হয়। এখানে এটিও স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, মসজিদ ফযলের প্রতিবেশীদের মসজিদে আগমনকারী আহমদীদের কারণে এবং ট্রাফিক ও পার্কিং এর কারণে কষ্ট ও অভিযোগ ছিল। এজন্য নতুন জায়গায় (অর্থাৎ ইসলামাবাদে) নামাযের জন্য বা ইসলামাবাদে আগমনকারীদের জন্য প্রতিবেশীদের এবং এলাকার লোকদের যেন কোনরূপ অভিযোগ না থাকে। তাদেরকে অভিযোগের সুযোগ দিবেন না। নামাযের জন্য বা এমনিতেও যারা ইসলামাবাদে আসবেন তারা তাদেরকে কোন প্রকার অভিযোগের সুযোগ দিবেন না। (ইসলামাবাদের) আশেপাশের লোকেরা আসবেন, ট্রাফিক আইন মেনে চলা আর সাবধানতার বিষয়টি সর্বদা দৃষ্টিগোচর রাখুন।

জুমুআর নামাযের যতটুকু সম্পর্ক আছে আমি সচরাচর এখানে অর্থাৎ বায়তুল ফুতুহ্'তে এসে জুমুআর নামায পড়াবো। আমীর সাহেবকে আমি বলেছি, তিনি রীতিমত পরিকল্পনা করে জামাতসমূহকে জানিয়েও দিবেন যে, কারা বা কোন কোন জামা'ত ইসলামাবাদে জুমুআ পড়বেন বা কারা সেখানে জুমুআ পড়বে পড়তে চান! সেখানকার পার্শ্ববর্তী জামা'তগুলোই হবে, তাদের মধ্য হতে যারাই পড়তে চাইবেন তারা সেখানে গিয়ে (নামায) পড়তে পারবেন। কোন্ কোন্ এলাকার লোক এর আওতাভুক্ত হবে আর এর বণ্টন কেমন হবে? (তা আমীর সাহেব জানিয়ে দিবেন)। ইসলামাবাদের ২০ মাইলের ভিতর বসবাসকারীরা সেখানেই সমবেত হতে পারেন এবং জুমুআ পড়তে পারেন। যাহোক, বিস্তারিত আমীর সাহেবের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট জামা'তের কর্মকর্তাগণ প্রেসিডেন্টগণ পেয়ে যাবেন। ২০ মাইলের বাইরের যারা সেখানে জুমুআ পড়বে তাদের সম্পর্কেও জানা যাবে যে, সেগুলো কোন্ কোন্ জামা'ত অথবা কীভাবে তাদের বিন্যস্ত করা হবে। যাহোক, পুনরায় আমি একথাই বলবো, দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এই পরিকল্পনা এবং সেখানে স্থানান্তরকে সবদিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করেন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত

পশ্চিম থেকে সূর্যোদয়
টিলফোর্ড-এর পবিত্র ভূমি ইসলামাবাদ

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

ফার্ণহ্যাম ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার ধর্মীয় স্থাপনাসমূহ: সম্প্রতি ইউরোপের কয়েকটি দেশে সাফল্যজনক সফর শেষে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ইংল্যাণ্ডস্থ মরকযে প্রত্যাবর্তন করেছেন। প্রসঙ্গতঃ সেখানকার টিলফোর্ড অঞ্চলের পবিত্র-ভূমি ইসলামাবাদ-এর কিছু ঐতিহাসিক তথ্য এই নিবন্ধে তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে।

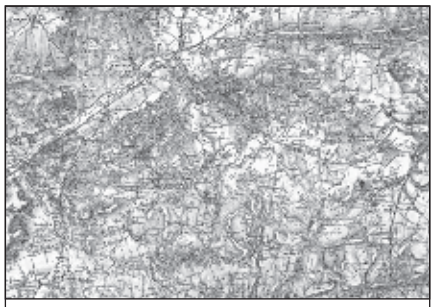

টিলফোর্ড-এর পুরনোদিনের একটি মানচিত্র

বিলাতের অনেক শহর ও স্থানের নামের সাথেই 'হ্যাম' প্রত্যয়টি সংযুক্ত দেখা যায়, এর অর্থ হচ্ছে– ঘেরাও বা বেষ্টনী। বিলাতের এক গ্রামাঞ্চল 'সার‍্যে'-ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদে ঢাকা এক বিস্তীর্ণ জায়গা, আর সেজন্য এটিকে 'ফার্ণহ্যাম' নামে ডাকা হয়। সাম্প্রতিক কালে, খনন কাজ চালিয়ে পুরাকালের নিদর্শনমুলক যে বস্তুগুলো সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে সেসব চুল্লী, যেগুলো তৈরী হয়েছিল প্রস্তর যুগের শুরুতে। অধিকতর খনন কাজ চালিয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ আরো এমন সব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সেখানে পেয়েছেন, যেগুলো পরবর্তী যুগকালের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ– মধ্য প্রস্তর যুগ থেকে পরবর্তী যুগ, তাম্রযুগ থেকে লৌহ যুগ আর রোমীয়-ব্রিটিশ দখলদারী আমল থেকে পরবর্তী শতাব্দীগুলোর সাথেও রয়েছে এর যোগসূত্র।

১৯২৪ সালের খননকর্মের এক রিপোর্ট, মাটিচাপা থাকা এমন একটি নগর-কাঠামোর অস্তিত্ব প্রকাশ করেছে, যেটি টিলফোর্ড-এর ইসলামাবাদ থেকে মাত্র ৩ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। ইতিহাসে ফার্ণহ্যাম-এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ৬৮৮ খৃষ্টাব্দে, কালের দিক থেকে যা মহানবী (সা.)-এর ওফাতের ৫০ বছরের কাছাকাছি সময়কালে। ওয়েজেক্স-এর রাজা ক্যাডোয়ালা (৬৮৫-৬৮৮) এই ভূখণ্ডটি দান করেছিলেন একটি সন্ন্যাস-আশ্রম তৈরী করার জন্য, আর এক সনদে এ বিষয়টি নিম্নরূপ বাক্যে লিপিবদ্ধ আছে :

"৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্ট স্যাক্সসন্স-এর রাজা ক্যাডোয়ালা একটি গীর্জা স্থাপনের জন্য বিন্টন ও চার্ট এর কিছু জমিসহ স্যার‍্যে-র ফার্ণহ্যাম-এর ভূখণ্ডটি স্যাডিডষ্ট ও ক্রিসওয়া-কে দান করেছেন"। *(P H Sawyers, Anglo-Saxon Charters: An Annotated List and Bibliography, Offices of the Royal Historical Society, London, 1968)*

সুতরাং ফার্ণহ্যাম ও এর পার্শ্ববর্তী ভূখন্ডের প্রথম উল্লেখটি তখন ঘটে, যখন এই রাজা এ শহরটি ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাটি গীর্জা

তৈরীর জন্যে উইনচেষ্টারের বিশপকে দান করেন। ৮ম শতাব্দী নাগাদ এ অঞ্চলটি উইনচেষ্টারের বিশপ কর্তৃক শাসিত ও পরিচালিত হয়। আর উইনচেষ্টারের বিশপ এবং তার বংশধরেরা পরবর্তী এক হাজার বছর ধরেই এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এজন্য, এটিকে উইনচেষ্টারের বিশপের খাস-খামারের মর্যাদা দান করা হয়। *(M W Thompson, Farnham Castle, Ministry of Works, London, 1961)*

পরবর্তী সময়ে এই খামারের এক লর্ডকে তার পার্শ্ববর্তী প্রসারমান এক যাজক পল্লী থেকে কর আদায়েরও অধিকার প্রদান করা হয় আর প্রসারিত এই যাজক পল্লীর নাম রাখা হয় 'হাম্ড্রেড'। ১০৮৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়ী উইলিয়াম যখন এই নির্দেশ প্রদান করেন যে বিলাত-ভূখণ্ডের বিস্তারিত এক জরিপ (Domesday Survey) করা হোক, যাকে আদমশুমারী ও ভূমি জরিপ বলা হয়, ফার্ণহ্যাম-এর 'হাম্ড্রেড' তখন ওয়েভারলি, এলষ্টেড ও টিলফোর্ড সহ প্রায় ১৬টি যাজকশাসিত পল্লীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। *(E Robo, Mediaeval Franham: Everyday Life in an Episcopal Manor, EW Langham, 1935)*

তদানিন্তন বিলাতের বাকী অংশগুলোর ইতিহাসের মতই পরবর্তীতে ধর্ম ও রাজনীতি ঠিকই একত্রে জড়িয়ে যায়। যাহোক, আমরা জানি যে, ধর্মের এ প্রাথমিক মূলনীতি, সেটি ইসলামের পবিত্র নবী (সা.)-এর ওফাতের মাত্র কয়েক বছর পরই ফার্ণহ্যাম ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র নবী (সা.) এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আখেরী যামানায়-ইসলামের সূর্য্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, আর তখন খৃষ্টধর্মের সাথে প্রতিযোগিতা করে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) জয় লাভ করবেন। বিশাল এই প্রতিযোগিতার ভিত্তি এই ফার্ণহ্যামেই স্থাপিত হচ্ছে, ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের ভিত্তিসমূহের বিস্তৃতি যা মানানসইভাবে ঘটিয়ে চলছে।

ওয়েভার্লির সন্ন্যাস-আশ্রমঃ

খুবই ছোট একটি শহর হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের ইতিহাসে বিলাতের ফার্ণহ্যাম গুরুত্বপূর্ণ স্থানের মর্যাদা রাখে। লণ্ডন ও উইনচেষ্টারের মাঝখানে প্রায় সম-দূরত্বে এ শহরটির অবস্থান। উইনচেষ্টারের বিশপ সাহেব ছিলেন এ রাজ্যের সর্বোচ্চ-শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তাদের অন্যতম এবং প্রায়শ:ই তিনি বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করতেন। সেমতাবস্থায় ফার্ণহ্যাম স্বভাবতঃই উইনচেষ্টারের বিশপের লণ্ডনে আসা-যাওয়ার পথে অথবা বিশপ হিসেবে তার এলাকাধীন অন্যান্য অঞ্চলে ভ্রমণের সময় এক আশ্রয়স্থলে পরিণত হ'তো। উইনচেষ্টারের বিশপ যেহেতু ফার্ণহ্যাম-এর জমিদারীরও শাসক ছিলেন, সে কারণে এ শহরটি হেনরী অব ব্লইজ (১১২৯ থেকে ১১৭১ পর্যন্ত উইনচেষ্টারের বিশপ ও বিজয়ী উইলিয়াম-এর পৌত্র) -এর জন্য প্রিয় এক শহর ছিল, যেখানে ১১৩৮ সনে তিনি এক দুর্গ নির্মাণের কাজ শুরু করেন, যেটি বর্তমানে "ফার্ণহ্যাম দুর্গ' নামে পরিচিত। *(H E Malden, The Victoria History of the County History of Surrey, Vol 4, 1912)*

সুসজ্জিত এক সেনানিবাস এবং এর সমরাস্ত্রের গুদামটি, যা দুর্গটি নির্মাণের সাথে সাথেই তৈরী হয় আর এ প্রসাদটিই হচ্ছে ওয়েভার্লি সন্ন্যাস-আশ্রম, যেটি উইনচেষ্টারের তদানিন্তন বিশপ এবং বিলাতের লর্ড চ্যান্সেলর (১১০০-১২২৯) উইলিয়াম জেফোর্ড কর্তৃক নির্মিত হয়। বিলাতে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে তিনি প্রচণ্ড প্রভাবশালী এক ব্যক্তি, যিনি ফার্ণহ্যাম'কে সন্ন্যাস-আশ্রম হিসেবে পছন্দ করেন, বিলাতের ধর্মীয় ইতিহাসে সেকালটি ফার্ণহ্যামের জমিদারীর গুরুত্বকেই নির্দেশ করে। *(H Brakspear, Waverley Abbey, The Surrey Archaeological Society, Guildford, 1905)*

ইতিহাসবিদগণ এটি স্বীকার করে থাকবেন যে ওয়েভার্লির সন্ন্যাস-আশ্রমকে ৬০ একর ভূমি দানের বিষয়ে উইলিয়াম জেফোর্ড-এর সিদ্ধান্তটিই হতে পারে ৬৮৮-এর সেই সনদ, যা ফার্ণহ্যাম'কে ধর্মীয় কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করেছে।

ওয়েভার্লির শুভ্র পোশাক পরিহিত সন্ন্যাসীগণঃ

নার্সিয়ার সেইন্ট বেনিডিক্ট, যার জীবনকাল ছিল ৪৮০ থেকে ৫৪৭ খৃ: পর্যন্ত । তিনি ইসলামের পবিত্র নবী (সা.)-এর জন্মের প্রায় ৩০ বছর পূর্বে মারা যান। পশ্চিমা খ্রিষ্টান-সমাজ গঠণে তার বিশাল প্রভাবের কারণে তিনি ঋষি হিসেবে খ্যাত। ৫১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি 'বেনিডিক্ট এর বিধিমালা' (Rule of Saint Banedict) নামে এক নির্দেশনামা জারী করেন, যেটি ক্যাথলিক গীর্জার প্রাথমিক সংবিধান (major Catholic monastical order) হিসেবে গৃহীত এবং ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে। সেইন্ট বেনিডিক্ট-এর রীতির মান্যকারী সন্ন্যাসীরা তাদের পোশাকের রং-এর কারণে সাধারণত কালো সন্ন্যাসী হিসেবে পরিচিত ছিল।

ওয়েভার্লির গির্জার ধ্বংসাবশেষ

গির্জাগুলো স্থাপিত হয়েছিল ফ্রান্সের ক্লনি-তে, যেগুলো পরিচিত ছিল পশ্চিমা-সন্ন্যাস ধর্মের ভিত্তিরূপ সদর দপ্তর হিসেবে। ১০৯৮ খৃষ্টাব্দে ক্লনির গির্জার কতিপয় সন্ন্যাসী এ অভিযোগ উত্থাপন করে যে, সেইন্ট বেনিডিক্ট-এর যে আইন তা ক্লনিতে যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে না, আর তা প্রতিষ্ঠায় মৌলেসমি'র এবোট রবার্ট-এর নেতৃত্বে সেইন্ট বিনিডিক্ট-এর আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠকল্পে তারা সেই 'সন্ন্যাস-সম্রাট'-এর কর্তৃত্ব ত্যাগ করে। এরপর তারা ফ্রান্সের ডিজন-এ বসতি

স্থাপন করে আর পরবর্তীতে তাদের এ সন্ন্যাস-আশ্রমকে ইউরোপের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দিতে এবং প্রতিষ্ঠা করতেও চেষ্টিত হয়। *(H Brakspear, Waverley Abbey)*

ফ্রান্সের বাইরে প্রথম যে সন্ন্যাস-আশ্রমটি তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল, তা ছিল ওয়েভারলি উপত্যকায়, যা ফার্ণহ্যাম থেকে মাত্র ১ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। কালো পোশাকধারী সন্ন্যাসীদের কর্তৃত্ব, যা থেকে তারা আলাদা হয়ে এসেছিল, তাদের থেকে স্বতন্ত্র রাখতে তারা নিজেদের নামকরণ করে "সাদা সন্ন্যাসী" আর বিভাজিত তাদের এ শাখার আনুষ্ঠানিক নামটি ছিল এ সন্ন্যাসী দলেরই একজনের নির্দেশক্রমে। হেনরী অব ব্লইজ -এর সাথে আন্তরিক সম্পর্কই উইলিয়াম জিফোর্ড-এর কাছ থেকে বিশাল-বিস্তৃত এ ভুখণ্ডটি অনুদান হিসেবে পেতে তাদেরকে সহায়তা করে আর উইলিয়াম জিফোর্ড-এর সাথে হেনরি-র যে আন্তরিক সম্পর্ক, সেটিও স্পষ্ট হয় এ ঘটনা থেকেই যে, উইলিয়ামের পর হেনরি-ই উইনচেষ্টার-এর বিশপ-এর উত্তরাধিকারী হন, বিলাত জুড়ে যার অধিকারের ব্যাপ্তি, কর্তৃত্ব ও প্রভাব ওপরে বর্ণিত হয়েছে।

জিওয়েন ওয়্যার'এর বর্ণনায় শুভ্র পোশাকধারী পাদ্রীর আগমন ঃ

"এ্যাবট জন'এর নের্তৃত্বে ১২ জন পাদ্রীর এক সন্ন্যাসীদল চ্যাটস'এর অদূরে 'আমনি' থেকে আগমন করে। তৎকালের সুপরিচিত প্যাঘাম পোতাশ্রয়ে সমম্ভবত: তারা অবতরণ করে। এর পর পায়ে হেটে মিডহাষ্ট হয়ে ২৪ নভেম্বর, ১১২৮ ফার্ণহ্যামে পৌঁছায়। পাদ্রীদের জাঁকালো কোন পোষাকে নয়; ধর্মপ্রচারকদের উদ্দীপনায় সঞ্জীবিত হয়ে সাদাসিধা পোশাকে ছোট্ট এই কাফেলাটি সম্মুখভাগে কাঠের পুতুলসদৃশ ক্রুশ দৃশ্যমান করে নীরবে বয়ে আনে; আর 'সিষ্টারসিয়ান ক্যাথলিক' রীতি এমনটাই ছিল "।

এ কাজে তাদের যে সফলতা, তা পরিমাপ করা যেতে পারে তাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা আর রাষ্ট্রের বিস্তৃতি দ্বারা ২০ বছরের এক সময়কালের মধ্যেই তারা তাদের সন্ন্যাসীদের সংখ্যা ৭০-এ আর সমমনা অনুসারীদের সংখ্যা ১৬০-এ বর্ধিত

করতে পেরেছে এবং তাদের সেই ৬০ একর ভূমিকে ৫৭১ একরে বিস্তৃত করায় সক্ষম হয়েছে। ধর্মীয় কর্মকান্ড আর সন্ন্যাসীদের প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে তারা সুন্দর একটি মঠ এবং শয়ন শালাও নির্মাণ করে; এতে তাদের অঞ্চলে, স্থাপনায় ৪টি সেতু এবং উৎপাদক্ষম একটি কারখানা যুক্ত হয়। *(Brakspeare, Waverley Abbey)*

এই যে বিস্তৃতভূমি– যা উইনচেষ্টারের বিশপ এক উপহার হিসেবে দান করেন, তা ১১৮৭ সন নাগাদ সেই এলাকাকেও যুক্ত করে, যেটিকে বর্তমানে আমরা টিলফোর্ড হিসেবে জানি। অর্থাৎ এলষ্টিড থেকে ফার্ণহ্যাম শহরের সীমানা পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ঘটে।

এতোটা অধিক পরিমাপের ভূমির প্রয়োজন কী তাদের ছিল? ইতিহাসবিদদের মতে মুখ্য যে প্রয়োজনটি তাদের ছিল, তা হচ্ছে– তাদের পালিত হাজার হাজার মেষ-এর জন্য চারণভূমি অর্জন করা। শুভানুধ্যায়ীরা এসব সন্ন্যাসীকে মেষ উপহার দিতেন, যেগুলোর সংখ্যা বেড়ে গিয়ে কয়েক হাজারে পৌঁছে যায়, যেগুলোকে তারা বনের উঁচু ভূমিতে রাখতেন, যেখান দিয়ে বর্তমানে শীপহ্যাচ নামক একটি সড়ক চালু আছে।

রাজা ৮ম হেনরীর শাসনকালে বিলুপ্ত হবার পূর্বে 'ওয়েভারলি অ্যাব্বে' মঠটির প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব অধিনস্ত মঠগুলোতে ৪ প্রজন্ম ধরে অনুসৃত হয়, যেগুলোর অন্যতম মঠটি হচ্ছে সমারসেট-এর 'ফোর্ডি অ্যাব্বে' মঠ; এর অধ্যক্ষ ছিলেন 'ব্যান্ডুইন'। পরবর্তীতে তিনি অ্যাঙ্গলিকান চার্চের সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে উন্নীত হয়ে "ক্যান্টারবারী'র আর্চ বিশপ" হোন। *(Ware, White Monks)*

ডি ডি নোলস প্রদত্ত 'ওয়েভারলি অ্যাব্বে' মঠটির স্থাপত্যের সংক্ষিপ্ত এক বর্ণনা তুলে ধরা এখানে অত্যুক্তি হবে না যে, তিনি একে "সরল-সুন্দর এক স্থাপত্যের নিদর্শন" বলে আখ্যায়িত করেছেন। সহজবোধ্য আর মনোরম সব সারি, সূচাগ্র সব খিলান আর সুন্দর সব সমানুপাত ও ক্ষুদ্রকায় সামান্যতম এক অলংকরণই এটিকে অসাধারণ সাজে সাজিয়েছে। *(D D Knowles, The Religious Orders in England, Cambridge University Press, 1950)*

সার্ব্যে'র কেন্দ্রভূমে ওয়েভারলির দৃষ্টিনন্দন উপত্যকায় অবস্থিত ৪০০ বছর ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়েভারলি মঠটির কর্তৃত্ব রাজা ৮ম হেনরির জারীকৃত "আশ্রম বিলুপ্তিকরণ আইন"–এর আওতায় ১৫৩৬ সনে অবসান ঘটে। *(C Kerry, A History of Waverley Abbey, Andrews and Son, Guildford, 1873)*

জি.ওয়ের (Gwen Ware)-এর ভাষায়– "শান্তিপ্রিয়, পরিশ্রমী এবং বাস্তব বদান্যতার এক মূর্ত প্রতীক শত্রুতায়ও যারা প্রশান্ত থাকত; এমনই ছিল সেই সম্প্রদায়, যেটি দ্বীপতুল্য এই উপত্যকায় বসবাস ও কার্যক্রম চালাতো"।

আহমদীয়া মুসলিম মিশন

ওয়েভারলি সন্ন্যাস-আশ্রমে সাদা-সন্ন্যাসীদের পদচারণা বহুকাল আগেই শেষ হয়েছে আর সেই সাথে সেসব দিনেরও অবসান হয়েছে যখন ধর্মই ছিল বিলাতের এক অখণ্ড অধ্যায়। এরপর সুদৃশ্য ওয়েভারলি উপত্যকা, ৪০০ বছরের সুদীর্ঘ এক সময় অতিবাহিত করে যে সময়কালে ক্যাথলিক সেই চার্চটিকে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ধ্বংস হতে দেখে।

সময় এগিয়েই চলে ১৯৮৪ সনের দিকে, আর ছোট্ট অথচ উদীয়মান এক সম্প্রদায় তাদের বসতি স্থাপনের জন্য একখণ্ড ভূমির অন্বেষণে রত থাকে। টিলফোর্ড-এ তারা এমন একটি জায়গা আবিষ্কার করে যেটি এককালে ছিল ওয়েভারলির সন্ন্যাশ্রমেরই এক অংশ, আর তারা জনশূণ্য ও পরিত্যক্ত এ ভূখণ্ডটিই ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সময় এ ভূখণ্ডটি কোন খ্রীষ্টানের দখলদারিত্বেও ছিল না আর না ছিল এটি কোন বিশপ কিংবা কোন রাজা-প্রদত্ত এক উপহার। বস্তুত: এটিতে ছিল এমন এক মুসলিম সম্প্রদায়, যারা কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর পবিত্র সত্তায় ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমনে বিশ্বাসী। এটিই হল আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যারা এ ভূখণ্ডটি ক্রয় করে তাদের অত্যন্ত সীমিত সম্পদ দিয়ে, যা তারা আহরণ করেছে কেবলমাত্র তাদের সদস্যদের দেয়া আর্থিক কুরবানী থেকে। এভাবে চার শতাব্দী পর এ ভূমিটিতে ধর্মীয় এক উদ্দীপনা আবার ফিরে এসেছে। আধ্যাত্মিকতার সেই হাওয়া, ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে এই জমিনে যা পৌঁছেছিল, সেটি আখেরী জামানার মসীহ্-এর কালে পুনরায় ফিরে আসে।

ভূমিটি ক্রয় আর ভবন তৈরী ও তা পুনঃসজ্জিত হওয়ার সাথে সাথে আহমদীয়া জামা'ত এখানে বসতি স্থাপন করে এবং এটিকে নামায আদায় ও অফিস-কর্মে এবং সেসব মানুষের আবাসনের কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে, যারা নিজ ধর্মের সেবায় তাদের প্রাণ উৎসর্গ করেছে। এ স্থানটির নামকরণ করা হয় 'ইসলামাবাদ' অর্থাৎ ইসলামের আবাসস্থল।

এ জামা'ত সারা বিশ্বে দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে আর এর অনুসারীরা টিলফোর্ডের ইসলামাবাদের বিশাল ভূখণ্ডে প্রায়ই একত্রিত হয়। তাদের "আল্লাহু আকবার" (আল্লাহ্ মহান)-এর প্রবল উদ্দীপনাপূর্ণ স্লোগানগুলো দেশটিতে ধর্মীয়-উদ্দীপনার প্রত্যাবর্তন ঘোষণা করে,

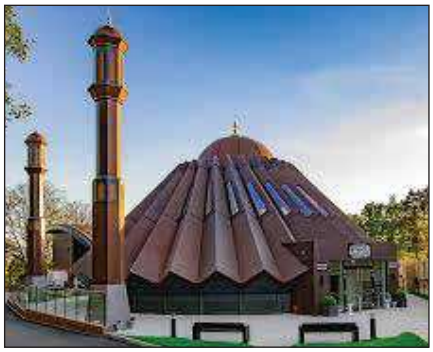

যা সারিবদ্ধ পাহাড়গুলোর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। তাদের ইসলামের বাণীর শান্তিপূর্ণ প্রচারণা টিলফোর্ডের-ইসলামাবাদ থেকেই চলতে থাকে, তবে তা আটটি দশকের পুরনো কাঠের এক অবয়বকে আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি অর্জনে অনেকগুলো পর্যায় অতিক্রম করার মাধ্যমে সে বিষয়ে সবুজ-সংকেত লাভ করার পর সম্ভব হয়েছে।

এভাবেই কেটে যায় ৩৫ বছরের আরো দীর্ঘ একটি সময়। পরিশেষে ২০১৬ সনে ওয়েভারলি কাউন্সিল কর্তৃক আহমদীয়া জামা'ত-কে টিলফোর্ডের এই ভূমি-খণ্ডের ওপর তাদের কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর নির্মাণের অনুমতি প্রদান করা হয়। একাজটি চলতে থাকে ৩ বছর ধরে, এর পর সেখানে গড়ে ওঠে খুবই সুন্দর একটি বসতি, যেখানে সেসব মানুষের পরিবারগুলো বসবাস শুরু করে, যারা ধর্মের সেবায় যুগ-মসীহ্-এর আগমণ-বার্তা প্রচারিত করতে নিজদেরকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করার অঙ্গীকার করেছে। সুন্দর একটি মসজিদ, যেখানে দৈনিক পাঁচবার সর্বশক্তিমান খোদার ইবাদত করা হয়, সেটিই হচ্ছে এখন এ উপত্যকায় স্থাপত্যের এক দৃষ্টিনন্দন নিদর্শন। এ স্থাপত্যটির বর্ণনা দিতে গিয়ে ড: নোলস-এর উক্তির প্রতিধ্বনি আবারও স্মরণ করা যেতে পারে।

"অনাড়ম্বর কিন্তু খুবই সুন্দর এক স্থাপত্য– পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য আবাসনের সব সারি নিখুঁত অনুপাতে সাজানো স্বল্পতম এক অলংকরণে সজ্জিত"। এখানে বসবাসরত এবং এর সাথে সম্পৃক্ত লোকদের পরিচিতি বর্ণনা; জিওয়েন ওয়্যারের কথারই প্রতিধ্বনি :

"শান্তিপ্রিয়, পরিশ্রমী এবং ব্যবহারিক দানশীলতার সাথে মন্দ অবস্থায়ও যারা প্রশান্ত; এমনই এক সম্প্রদায় ইসলামাবাদে বসবাস ও কর্ম-সম্পাদন করে চলছে"।

বিশ্ববাপী বিস্তৃত এই সম্প্রদায়ের নেতা ও যুগ-মসীহ্(আ.)-এর খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এ আবাসন এলাকাতেই বাস করেন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত আর সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত বিশ্বকে তিনি শান্তির দিকে আহ্বান করে চলছেন। তার এ মিশনটি হচ্ছে বিশ্বব্যাপী, আর তিনি মনে-প্রাণে শান্তি ধারণ লালণ ও বিস্তারে এ বিশ্ব পরিভ্রমণ করেন পশ্চিমা দুনিয়ায় ধর্মের এক আদি ভিত্তি-ভূমি ফ্যার্ণহ্যাম-এর নিকটস্থ এই টিলফোর্ড থেকে। এখান থেকেই বিশ্বকে তিনি (আই.), এর সৃষ্টিকর্তার দিকে আহ্বানে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

ইসলামাবাদ হচ্ছে শান্তিপ্রিয় এক মুসলিম সম্প্রদায়ের আবাসস্থল। এটি শিপহ্যাচ লেইনের পাশে অবস্থিত। যেগুলোর নামে এটির নামকরণ, সেসব মেষ, সেগুলো এখানে আর নেই। যাহোক, মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বিশ্বাস করেন যে, হারানো সেসব মেষ কেবল ইসরাঈলীদের কিংবা ওয়েভারলির সন্ন্যাসীদেরই মেষ নয়, বরং সেগুলো হচ্ছে সকল জাতিরই মেষ, যেগুলো এই শীপহ্যাচ লেইন-এ একদিন একত্রিত হবে। সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন সব ধর্মভিত্তিক জাতি এই ইসলামাবাদে একত্রিত হয়ে এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্'র মহিমা এবং মহানবী (সা.)-এর গৌরবময় মর্যাদা তুলে ধরবে, ইনশাআল্লাহ্!

আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্রই আমাদেরকে সেই শুভদিন দেখার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন!

ইউরোপে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর মাসাধিককাল ব্যাপী এক সফল সফর

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

বিদায়-মূহুর্তঃ জার্মানী

ইউরোপে সুদীর্ঘ, ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ এক সফর সমাপ্ত করে ২৭ অক্টোবর ২০১৯ শরতের এক বিকেলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ইসলামাবাদে অবস্থিত সদর-দপ্তরে ফিরে এসেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্! হল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীর জনগণের কাছে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা প্রচার করতেই হযরত আমীরুল মু'মেনীন মাসোর্ধ কালব্যাপী-এ সফর করেন।

এ সফরকালে হুযূর (আই.)-এর ভাষণ সমূহের সংখ্যা আর এজন্য তাঁর যে ব্যস্ততা, সেটি যেহেতু ছিল ব্যাপক, তাই সেগুলো মনোযোগের সাথেই গণনা করতে হয়েছে। জলসা সালানা সমূহে, মসজিদ সমূহ উদ্বোধনে, বিশিষ্টজন ও সংসদ-সদস্যদের সাথে সংবাদ-সম্মেলনে এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে বৈঠকেও হযরত আমীরুল মু'মেনীন (আই.) দিকদিশারী কথাবার্তা বলেছেন। এসব কর্মসূচী ছাড়াও হুযূর (আই.) দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায বাজামাত পড়িয়েছেন, জুমুআর খুতবা প্রদান করেছেন এবং স্থানীয় আহমদী ও অতিথিদেরকে সাক্ষাৎকারও দান করেছেন। এসব ঘটনার বিবরণ আল্লাহ্‌র ফজলে এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল-এ সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে। এমটিএ ইন্টারন্যাশনালের পাশাপাশি প্রেস ও সংবাদ-মাধ্যমসমূহে, আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স ও আল হাকামসহ বেশ ক'টি পত্রিকা ও চ্যানেলের মাধ্যমে সারা বিশ্বের আহমদীদেরকে আধুনিক সময়কালের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

এ সফরে হুযূর (আই.) আহমদী মুসলমানদেরকে তাদের দায়িত্বাবলী ও আমরা যা প্রচার করে থাকি, এর বাস্তব-প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন। হল্যান্ড ও ফ্রান্স-এর জলসা

সালানায় হযরত আমীরুল মু'মেনীন (আই.) আমাদেরকে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করার বিষয়টি স্মরণ করিয়েছেন এবং এ জামাতের মহান বিজয় সম্পর্কেও অবহিত করেন আর আমরা যেন এ দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন না হই- সে বিষয়েও সাবধান করেন।

এ জলসায় হুযূর (আই.) কেবল আহমদীদের উদ্দেশ্যেই কথা বলেন নি, বরং বিশেষ অধিবেশন সমূহে অ-আহমদীদের সাথেও মিলিত হয়েছেন। এসব বক্তৃতায় হুযূর (আই.) পবিত্র কোরআনের শিক্ষাসমূহের ব্যবহারিক-জ্ঞান ও মহা নবী (সা.)-এর মহান চরিত্র অংকন করে ইসলামের সত্যিকার চিত্র তুলে ধরেন। উদাহারনস্বরূপ- হল্যান্ড এর জলসায় হুযূর (আই.) এটি প্রমাণ করেন- ধর্ম কিভাবে "বর্তমান সময়ের সমস্যাদির কারণ হবার পরিবর্তে সমাধান হতে পারে"। এ বিষয়টি প্রমাণ করতে হযরত আমীরুল মু'মেনীন সর্বদাই পবিত্র কোরআন ও মহা নবী (সা.)-এর জীবনী উল্লেখ করে কথাবার্তা বলে থাকেন। ধর্ম, কিভাবে শান্তি বৃদ্ধি করে- সে বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে হুযূর (আই.) পবিত্র কোরআনের ১০নং সূরার ২৬নং আয়াতটি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন, এতে বর্ণিত আছে যে, "আর আল্লাহ্ আহ্বান করেন শান্তির নীড়ের দিকে, আর তাদেরকেই তিনি সৎপথে পরিচালিত করেন, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট"।

হুযূর (আই.) কল্যাণমণ্ডিত সফরকালে, হল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীতে বেশ ক'টি মসজিদের উদ্বোধন করেন। হুযূর (আই.) কর্তৃক মোট পাঁচটি মসজিদের উদ্বোধন হয়েছে, উদ্বোধনের পর তিনি (আই.) মসজিদ নির্মাণের সত্যিকার উদ্দেশ্য এবং ইবাদতকারীদের দায়িত্বাবলী বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। প্রতিবেশী, ধর্মীয়-নেতা, মেয়র, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের সামনে হুযূর (আই.) ইসলামের এসব শিক্ষা সবিস্তারে তুলে ধরেন। হুযূর (আই.) প্রদত্ত এসব বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল এই- মসজিদগুলোকে সামাজিক সংযোগ স্থাপনের কেন্দ্র হয়ে উঠতে হবে আর তা হবে "শঙ্কাহীন এক স্থান"। ইবাদতকারীদের উচিত, মসজিদে উপস্থিত হয়ে কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের যে দায়িত্ব- সেটিই পালন করা নয়, বরং মানবতার সেবা, বিশেষ করে পারস্পরিক নৈকট্যও হাসিল করা। স্থানীয় আহমদীদেরকে সম্বোধন করে হুযূর (আই.) সর্বদাই সহায়ক প্রতিবেশীদের প্রতি তাদের যে দায়-দায়িত্ব, তা পালন করার জোর তাগিদ দেন।

ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গ-এ 'মাহদী মসজিদ'-এর উদ্বোধন কালে সংক্ষিপ্ত একটি বাক্যের মাধ্যমে হুযূর (আই.) মসজিদের যে উদ্দেশ্য তা সুন্দরভাবে তুলে ধরে বলেন:

"এক অদ্বিতীয় খোদার উপাসনায় নিয়োজিত উপাসকদের একত্রে শান্তিতে বসবাস করার উদ্দেশ্যে, এ মসজিদটি নির্মিত হয়েছে"।

ফ্রান্স ও জার্মানীতে হুযূর (আই.) খুবই হৃদয়গ্রাহী ঐতিহাসিক দু'টো বক্তৃতা প্রদান করেন। মহা নবী (সা.) কী করে সমাজকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিয়েছিলেন আর মানুষের মাঝে পারস্পরিক মর্যাদাবোধ ও সহিষ্ণুতা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সে বিষয়ে ফ্রান্সে ইউনেস্কোর সদস্যবৃন্দ, রাজনীতিবিদ, বিশিষ্টজন এবং বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষাবিদের উপস্থিতিতে হুযূর (আই.) খুবই অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ও দৃষ্টি-বিকাশক এক বক্তব্য প্রদান করেন। ইসলামের আবির্ভাবে " আরবদের মধ্যে প্রথমবারের মত সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসভ্য এক সমাজ-ব্যবস্থা কিভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল"- সে বিষয়টির ব্যাখ্যাও হুযূর (আই.) প্রদান করেন। "মুসলমান বিজ্ঞানী, আবিস্কারক ও দার্শনিক, যারা বিশ্বের উন্নতিতে রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন, তাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ইসলামের পবিত্র নবী (সা.) কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন"- সে বিষয়েও অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করতে তথ্য-সমৃদ্ধ বক্তব্য দান করা হয়। হুযূর (আই.) ব্যাখ্যা করেন যে, "শুরু থেকেই ইসলাম শিক্ষা ও মানব-জ্ঞানের অপরিমেয়-মূল্যেও সীমাকে বর্ধিত করার ক্ষেত্রে তাগিদ প্রদান করে আসছে"।

ঐতিহাসিক দ্বিতীয় বক্তৃতাটি ছিল একই ধরনের, যা জার্মানীতে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়। এখনকার শ্রোতামন্ডলীও শিক্ষাবিদ আর ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা একই ভাবে সম্পৃক্ত ছিল। এ অধিবেশনে "ইসলাম ও ইউরোপ: সভ্যতা সমূহের এক দ্বান্দিক সংঘাত কি ?"- এ বিষয়ের ওপর হুযূর (আই.) জাঁকালো এক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় হুযূর (আই.) সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বরূপ তুলে ধরতে, 'সভ্যতা' মানব-সমাজের প্রযুক্তি ও বুদ্ধিগত উন্নতিকে বুঝায় আর কোন একটি জাতির 'সংস্কৃতি' যে- সেই জাতির নৈতিকতা ও ধর্মীয়

মূল্যবোধকে নির্দেশ করে -এতদু'ভয়ের মধ্যকার সূক্ষ্ম যে পার্থক্যটি রয়েছে; তা তুলে ধরে গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য দান করেন।

শ্রোতামন্ডলীর কাছে হুযূর (আই.) এটি প্রমাণ করেন যে, ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে ইতিবাচক এক বিষয় আর সেটি পশ্চিমা-সমাজের প্রতি কোন হুমকি নয়। শ্রোতাবৃন্দকে তিনি খৃষ্টধর্মে- প্রচলিত সেই সংস্কৃতিকে সংস্কার করার পরামর্শ দেন, যেটি ইউরোপ থেকে বিদায় নিচ্ছে আর সে স্থলে নাস্তিকতাকে জায়গা করে দিচ্ছে।

যেসব অতিথি হযরত আমীরুল মু'মেনীন (আই.)-এর এসব কথা শুনেছেন, তাদের প্রতিক্রিয়া ও জবাব থেকে এটিই প্রতীয়মান হয়েছে যে, আমাদের ইমাম (আই.) সম্ভাব্য সর্বোত্তম এক পদ্ধতিতেই প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বের দরবারে আহমদীয়া মুসলিম জামাত তাদের খলীফার নেতৃত্বে মহান যে উদাহরণ উপস্থাপন করছে, অংশগ্রহণকারী সবাই একবাক্যে তারই সাক্ষ্য প্রদান করেছে।

এ বিষয়ে আমরা আমাদের পাঠকবৃন্দকে এসব অতিথির বিভিন্ন রিপোর্ট ও ভিডিও ফুটেজগুলো দেখে নিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, কেননা সে অনুষ্ঠানগুলো দেখলে তারা জানতে পান যে, এ জামা'তকে এবং সারা বিশ্বকে শান্তিপূর্ণ, সহিষ্ণু আর উত্তম এক সমাজের দিকে চালিত করার জন্য কি ভাবেই না তারা হযরত আমীরুল মু'মেনীন (আই.)-এর প্রশংসা করেছেন।

একইভাবে আমাদের সবার জন্যই এটি জরুরী যে, হুযূর (আই.) যে বক্তৃতা প্রদান করেছেন, সেটি যেন আমরা শ্রবণ করি, অনুধাবন করি আর চর্চা করি, যাতে প্রকৃত অর্থেই আমরা জানতে পারি যে, আহমদী মুসলমান হওয়ার প্রকৃত অর্থটি কী!

আল্লাহ্ আমাদের সুন্দর এ জামা'তটির সাফল্য জারী রাখুন, ঐশী-শক্তি দ্বারা আল্লাহ্ আমাদের ইমানকে মজবুত করুন আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর নেতৃত্বের মাধ্যমেই ইসলামের কাঙ্ক্ষিত সেই বিজয় প্রতিভাত হোক! আমীন!

DR. NAZIFA'S Smile Aid
your complete dental healthcare
Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY
Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid
Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces
Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka - 1212
Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471
Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

দোয়া কবুলিয়াত আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ

মাওলানা শরীফ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ্

পবিত্র কোরআন করিমের সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَلْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

অর্থাৎ "আমার বান্দাগন যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি তাদেরকে বলে দাও আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর (দোয়াকারীর) প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করে যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।"

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "দোয়া আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের শক্তিশালী প্রমান। বস্তুত আল্লাহ্ তা'লা একস্থানে বলেন "যখন আমার বান্দারা তোমার নিকট আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আল্লাহ্ কোথায় আর আল্লাহ্ যে আছে এর প্রমান কি? তুমি বলে দাও, তিনি অতি নিকটে এবং এর প্রমান হচ্ছে যখন কোন দোয়াকারী আমাকে ডাকে আমি তাঁর ডাকে সাড়া দেই।" এই উত্তর কখনো পূন্যবানগণ স্বপ্নের মাধ্যমে পায় এবং কখনো কাশফ বা দিব্যদর্শন ও ইলহামের মাধ্যমে। এ ছাড়া দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার কুদরত ও শক্তির প্রকাশ হয়ে থাকে যার মাধ্যমে জানা যায় তিনি সর্বশক্তিমান সকল সমস্যা দূর করেন। মোটকথা দোয়া বড় সম্পদ ও শক্তি। কোরআন শরিফে অনেক স্থানে দোয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে এবং এরুপ লোকদের কথাও বর্ণিত হয়েছে যারা দোয়ার মাধ্যমে নিজেদের বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। আলায়হেস সালামগনের জীবনের শিকড় ও তাদের সফলতার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে দোয়া। অতএব আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি নিজেদের ঈমান ও আমলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য দোয়ায় রত থাক। দোয়ার মাধ্যমে এরুপ পরিবর্তন হবে যা আল্লাহ্‌র ফজলে খাতামা বিল খায়ের হয়ে যাবে। *(মলফুযাত, সপ্তম খন্ড,পৃ:২৬৮,২৬৯)*

দোয়া একটি আরবী শব্দ। মূল অর্থের দিক থেকে বলা যায় এটির মানে কোন কিছু চাওয়াকে বুঝায়। ব্যাপক অর্থে এটির মানে হচ্ছে চাওয়া, কামনা করা এবং সাহায্য প্রার্থনাও হতে পারে। পরিভাষার দিক থেকে দোয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার নিকট নিজের বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য দোয়া করা এবং অভাব মোচনের জন্য যাচনা করা এবং তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাকে বলে। দোয়া করার ফলে আল্লাহ্ তা'লা এবং বান্দার মাঝে এক ধরনের গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়। যা দ্বারা দ্বীন দুনিয়া দুটিই লাভ হয়। পবিত্র কুরআনে সূরা ফুরকানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "তুমি অবিশ্বাসীদেরকে বল আমার প্রভূ প্রতিপালক তোমাদের কোন পরওয়া করেন না যদি তোমাদের দোয়া না থাকে। যেহেতু তোমরা (আল্লাহ্‌র বানীকে) মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছ, অতএব তার শাস্তি অচিরেই তোমাদের সাথে যুক্ত হবে।" *(সূরা ফুরকান)*

'মা ইয়াবাউবিহী'-এর অনেক গুলো অর্থ এখানে হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যদি তোমাদের দোয়াই না থাকে তাহলে মনে রেখ আমি তার পরওয়া করি না, কিছুই মনে করি না, গ্রাহ্য করি না বা তাকে কিছুই জ্ঞান করি না, অথবা আমি তাকে কোন মূল্যই দেই না বা তার কোন গুরুত্ব আছে বলে মনে করি না অথবা তাকে কোনরুপ সম্মান করি না। *(লেইন এবং মুফরাদাত)*

অতএব প্রিয় পাঠকগন! দোয়া এমন একটি মাধ্যম যা মানুষকে তার মন্দ কাজ থেকে সুরক্ষাকারী, পাপ থেকে বিরতকারী, নেকীতে অগ্রগন্যকারী। আর তাকে খোদা লাভে পথ পদর্শক এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভূক্তকারী। এ কারণে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যার ব্যাপারে দোয়া করার শিক্ষা দেন নি। এমন কি তিনি (সা.) বলেছেন যদি জুতার একটি ফিতাও প্রয়োজন হয় তাহলেও আল্লাহ্ তা'লার নিকট চাও।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রসূল করিম (সা.) বলেছেন, তোমরা নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট, দুনিয়ার খারাপ পরিনতি, দুর্ভাগা ও শত্রুদের ঘোর বিদ্ধেষাত্মক আক্রমন থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। *(বুখারী)*

এ যুগের প্রত্যাদৃষ্ট মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জীবনে দোয়া কবুলিয়াতের অসংখ্য ঘটনা আমরা দেখতে পাই। তিনি যে সকল বিষয়ে দোয়া করে গেছেন এখনো তা পূর্ণ হচ্ছে আর ভবিষ্যতেও হতে থাকবে ইনশা'ল্লাহ।

মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের ঘটনা: হযরত আকদাস বলেন, "একদা প্লেগের প্রবল আক্রমনের সময় যখন কাদিয়ানেও প্লেগ বিদ্যমান ছিল। সেই সময় মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব এম.এ কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হলেন আর তার সন্দেহ হল যে এটা নিশ্চিত প্লেগ। তিনি মৃত্যুপথযাত্রীর ন্যায় ওসিয়্যত করে দেন। মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেবকে সবকিছু বুঝিয়ে দেন। অথচ তিনি আমার ঘরের একটি অংশে বসবাস করতেন। যে ঘরের ব্যাপারে খোদা তা'লা এ ইলহাম করেছেন, **"ইন্নি ওয়াহাফেজু কুল্লা মান ফিদ্দার"** তখন আমি তাকে দেখার জন্য গেলাম এবং তাকে বিচলিত ও ভীত দেখে বললাম যদি আপনি প্লেগে আক্রান্ত হন তাহলে আমি মিথ্যাবাদী আর আমার ইলহামের দাবী ভুল। এটা বলে আমি তার কপালে হাত রাখলাম আল্লাহ্ তা'লা এক আশ্চর্য ব্যবহার দেখালেন হাত স্পর্শ করার সাথে সাথে তার দেহ এমন শীতল অনুভূত হয়েছে যেন কখনো জ্বরের নাম ও নিশানা পর্যন্ত নাই।"

সুতরাং হুযূর (আ.)-এর নিজের ইলহামের প্রতি এরুপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি এটা কল্পনা করতে পারেন নি, তার ঘরেও প্লেগের ঘটনা ঘটতে পারে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত নবী করিম (সা.) বিপদের সময় দোয়া করতেন, **লাইলাহা ইল্লাল্লাহুল আলীমুল হালীম, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়া রাব্বুল আরশিল আযীম, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়া রাব্বুস সামাওয়াতে ওয়া রাব্বুল আরযি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম।** অর্থাৎ "আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই যিনি (সর্বজ্ঞ) ও ধৈর্য্যশীল। তিনি ব্যতিত কোন মাবুদ নেই, তিনি বিশাল আরশের অধিপতি। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই। তিনি আকাশমালা ও পৃথিবীর অধিপতি এবং মহান আরশের প্রভু।" *(বুখারী)*

সুতরাং যদি নিজের চরম বিপদের সময় কেউ হযরত রসূল করীম (সা.)-এর এই দোয়া কাকুতি মিনতির সাথে করে তো আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

কেননা যদি কেউ আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় বান্দা হয়ে যায় তো আল্লাহ্ তার বিপদে অবশ্যই তাকে তার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেন। অতীতে করেছেন, বর্তমানে করেন এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে, ইনশা'ল্লাহ।

দোয়ার স্বাদ পেতে হলে যা আবশ্যক তা হচ্ছে বিনয়ী থাকতে হবে। ব্যাকুলতা/বিগলিতচিত্তে আকুতি-মিনতি থাকতে হবে। যে দোয়া বিনীত আকুতি-মিনতি ও নিরিহ কান্নাসম্বলিত তা আল্লাহ্‌র ফজলকে অকর্ষন করে এবং গৃহিত হয়ে প্রকৃত উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌছাঁয়।

ফজল ও অনুগ্রহ লাভের নিকটতম পদ্ধতি হলো দোয়া। দোয়ার স্বাদ পেতে হলে যা আবশ্যক তা হচ্ছে বিনয়ী থাকতে হবে। ব্যাকুলতা/বিগলিতচিত্তে আকুতি-মিনতি থাকতে হবে। যে দোয়া বিনীত আকুতি-মিনতি ও নিরিহ কান্নাসম্বলিত তা আল্লাহ্‌র ফজলকে অকর্ষন করে এবং গৃহিত হয়ে প্রকৃত উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌছাঁয়। *(আল হাকাম: ২৪ আগষ্ট, ১৯০৩)*

তিনি (আ.) আরো বলেন, "মনে রাখবে দোয়া সেই অস্ত্র যা এ যুগে বিজয় লাভের জন্য আমাকে আকাশ থেকে দেয়া হয়েছে। আর হে আমার বন্ধুগন ! তোমরা কেবল এ দোয়ার অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধে বিজয় লাভ করতে পারবে। *(তাযকিরাতুশ শাহাদাতাঈন)*

প্রিয় ভাই ও বোনেরা দোয়া কবুলিয়াতের জ্বলন্ত নিদর্শন আমরা খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল হযরত মৌলানা আলহাজ্ব হেকীম নুরুদ্দিন (রা.) মাঝে অসংখ্য ঘটনা দেখতে পাই। পাঠকগণের উদ্দেশ্যে এখানে একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। আশা করি তা আমাদের সকলের ঈমানের উন্নতির কারন হবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-এর যুগের একটি ঘটনা। চৌধুরী হাকিম দ্বীন সাহেব বোর্ডিং এর একজন চাকুরীজীবি ছিলেন। তার স্ত্রী প্রথম সন্তানের জন্ম দেয়ার সময় খুব সমস্যার মাঝে ছিলেন। এই বিপদ সংকুল অবস্থায় রাত প্রায় ১২ টার সময় তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-এর কাছে যান। তাঁর ঘরের দরজায় কড়া নাড়েন/নক করেন। শব্দ শুনে জিজ্ঞাসা করেন কে? অনুমতি পাওয়ার পর ঘরে প্রবেশ করে স্ত্রীর সমস্যার কথা বলেন এবং দোয়া চান। হুযূর (রা.) তাড়াতাড়ি উঠেন এবং ভিতরের ঘর হতে একটি খেজুর এনে সেটিতে দোয়া পড়ে তার কাছে দেন। তাকে বলেন এটি তোমার স্ত্রীকে এখনই খাইয়ে দিবে আর সন্তান ভূমিষ্ট হলে আমাকেও সংবাদ জানাবে।

চৌধুরী হাকীম দ্বীন সাহেব বর্ণনা করেন আমি ফেরত এসে স্ত্রীকে খেজুর খাইয়ে দেই এরপর কিছুক্ষন পরেই আল্লাহ্ তা'লার ফজলে সন্তান ভূমিষ্ট হয়। ততক্ষনে অনেক গভীর রাত হয়ে গেছে আমি চিন্তা করলাম এত রাতে হুযূরকে দ্বিতীয়বার শুধুমাত্র সংবাদ দেওয়ার জন্য সজাগ করা ঠিক হবে না। ফজরের নামাযে উপস্থিত হয়ে বললাম আল্লাহ্‌র ফজলে খেজুর খাওয়ানোর কিছুক্ষনের মধ্যেই সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে যায়। এর

প্রতিউত্তর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) যা বলেছেন যা শ্রবন করা এবং স্মরন রাখার যোগ্য। তিনি (রা.) বলেন, "মিয়া হাকীম দ্বীন ! তুমি তোমার স্ত্রীকে খেজুর খাইয়ে দিয়েছ আর তোমার মেয়ে জন্ম লাভ করেছে। এরপর তুমি আর তোমার স্ত্রী আরামে শুয়ে পড়েছ। যদি আমাকেও সংবাদ দিতে তাহলে আমিও আরামে শুয়ে যেতে পারতাম। আমি তো সারারাত জেগে জেগে তোমার স্ত্রীর জন্য দোয়া করছিলাম।"

চৌধুরী হাকীম সাহেব এই ঘটনা বর্ণনা করে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন আর বলেন, "কাহা চাপড়াসি হাকীম দ্বীন আওর কাহা নুরুদ্দিন আযম"। *(মোবাশ্বেরীনে আহমদ পৃষ্ঠা: ৩৮, আসহাবে আহমদ খন্ড:৮, পৃষ্ঠা:৭১-৭২)*

তিনি (আ.) বলছেন যে, অখণ্ডভাবে দোয়া করে যাও, তওবা এবং এস্তেগফার কর, সেই দোয়াই কল্যাণকর হয়ে থাকে, যখন হৃদয় খোদার দরবারে বিগলিত হয় আর খোদা ছাড়া পরিত্রাণের অন্যকোন পথ যেন চোখে না পড়ে। খোদার দিকে ধাবিত হয় আর ব্যকুলতা, উৎকণ্ঠার সাথে নিরাপত্তার সন্ধানে থাকে সে অবশেষে রক্ষা পায়। প্রকৃত দোয়া কি? এটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলছেন যে, দোয়া দু'ধরণের হয়ে থাকে। এক সাধারণ দোয়া আর দ্বিতীয়টি সেই দোয়া, যে দোয়াকে মানুষ পরম মার্গে পৌঁছায়। এই দোয়াই সত্যিকার অর্থে দোয়া আখ্যায়িত হয়। অর্থাৎ মানুষ যেন দোয়াকে পরম মার্গে পৌঁছায়। এক ব্যাকুল পরিস্থিতির যেন অবতারণা হয়। মানুষের উচিত, কোন সমস্যায় নিমজ্জিত হওয়ার পূর্বেই বা সমস্যা দেখা দেয়ার পূর্বেই দোয়া করা। এটি নয় যে, কেবল সমস্যা দেখা দিলেই দোয়া করবে, সমস্যা দেখা না দিলেও দোয়া করা উচিত। কেননা, সে জানে না, খোদার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় কি বা আগামীকাল কি হতে যাচ্ছে। তাই পূর্ব থেকেই দোয়া কর, যেন তোমাদের রক্ষা করা হয়। অনেক সময় সমস্যা এমনভাবে আঘাত হানে যে, মানুষ দোয়া করার সুযোগই পায় না। তাই পূর্বাহ্নেই যদি দোয়া করে রাখা হয় তাহলে সমস্যার সময়ে সেই দোয়া কাজে আসে।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে এই দোয়া শিখিয়েছেন ঃ **أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي**

"আসলেহ লী ফি জুররে ইয়াতি"

যদি তোমরা ভাল থাকতে চাও আর তোমাদের ঘরে শান্তি বিরাজমান থাকুক তাহলে তোমাদের উচিত অনেক বেশী দোয়া করা। আর নিজ ঘরকে দোয়া দ্বারা পূর্ণ করে দাও। যে ঘরে সর্বদা দোয়া করা হয় আল্লাহ্ তা'লা সেই ঘরকে কখনো ধ্বংস করেন না।

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমার জন্য আমার সন্তানের সংশোধন কর। নিজের পবিত্র পরিবর্তনের দোয়ার পাশাপাশি নিজের স্ত্রী সন্তানের জন্যও দোয়া করে যাওয়া উচিত। কেননা, মানুষের ওপর বেশির ভাগ পরীক্ষা আসে সন্তান সন্ততির এবং স্ত্রীর কারণে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! দোয়া করতে করতে কখনো ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে দোয়া পরিত্যাগ করা উচিত নয়। নিজেকে এবং পরিবারকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করার সামাজিক অবক্ষয় থেকে মুক্ত রাখার একমাত্র উপায় বা পদ্ধতি হচ্ছে কায়মনবাক্যে আল্লাহ্‌র কাছে নাছোড়বান্দার ন্যায় দোয়া করা। এ যুগের হাকামান আদালান হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন,

অনুবাদ: "যদি তোমরা ভাল থাকতে চাও আর তোমাদের ঘরে শান্তি বিরাজমান থাকুক তাহলে তোমাদের উচিত অনেক বেশী দোয়া করা। আর নিজ ঘরকে দোয়া দ্বারা পূর্ণ করে দাও। যে ঘরে সর্বদা দোয়া করা হয় আল্লাহ্ তা'লা সেই ঘরকে কখনো ধ্বংস করেন না। যদি তোমরা সর্বদা আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরন কর তাহলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ আল্লাহ্ তা'লার ওয়াদা মজবুত। তিনি কখনো তোমাদের সাথে সেরকম ব্যবহার করবেন না যেরকম একজন দুষ্কৃতিকারী এবং সীমালঙ্ঘনকারীর সাথে করে থাকেন।" *(মলফুযাত ৭তম খন্ড, পৃ: ৩০৯)*

মু'মিনদের গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যাবলীর কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন যে, কুরআনে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

"ক্বাদ আফলাহাল্ মুমেনুনাল্লাযিনা হুম ফি সালাতিহিম খাশেউন"। *(সূরা আল মুমেনুন)*

দোয়া করতে করতে মানুষের হৃদয় যখন গলে যায় আর খোদার আস্তানায় নিষ্ঠা এবং সততার সাথে সেজদাবনত হয়ে তাঁর সত্তায় বিলিন হয়ে যায়, সমস্ত চিন্তা-ধারা বাদ দিয়ে তাঁর কাছেই কল্যাণরাজী এবং সাহায্য চায়, এতটা একাগ্রতা অর্জন হয় যে, একপ্রকারের বিগলন এবং প্রদাহ যদি আরম্ভ হয় তখনই সফলতার দার উন্মোচিত হয়। যদি ব্যাকুল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, হৃদয় যদি গলে যায়, কোমলতা সৃষ্টি হয়, তিনি (আ.) বলছেন যে, তবেই সাফল্যের দ্বার উন্মোচিত হয়। **"কাদ আফলাহাল মু'মিনুন"** মু'মিন সফলকাম হয় তারা যারা নিজেদের নামায ভয়-ভীতির সাথে আদায়

করে, পরম বিনয়ের সাথে পড়ে, ব্যাকুলতা তাদের ওপর ছেয়ে যায়, তিনি (আ.) বলছেন, তখন সাফল্যের দ্বার উন্মোচিত হয় যার মাধ্যমে জাগতিকতার মোহ শীতল হয়ে যায়, কেননা দু'টি ভালোবাসা সহ অবস্থান করতে পারে না। যেভাবে লেখা আছে, খোদাকেও চাইবে আর তুচ্ছ দুনিয়াও লাভ করতে চাইবে এটি উন্মাদের ধারণা বৈ কি, তুমি খোদাকেও সন্ধান করবে আর তুচ্ছ দুনিয়ার মোহেও আচ্ছন্ন হবে এটি অসম্ভব ধারণা, এটি উন্মাদনা। এটি উন্মাদের ধারণা, হ্যাঁ, খোদাকে সন্ধান কর যদি আল্লাহ্‌কে লাভ করতে পার তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পার তাহলে জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য অবশ্যই লাভ হবে। কিন্তু শুধু বস্তুবাদিতার পিছনে ছুটলে খোদাকে লাভ করা যায় না। নিজেদের ইচ্ছা, চাওয়া-পাওয়া, কামনা-বাসনাকে খোদার সন্তুষ্টির অধিন্যস্ত করলেই কেবল দোয়া গৃহিত হয়।

দোয়া গ্রহনীয় করার বা আল্লাহ্‌র ফজল নিজের প্রতি বর্ষন করানোর আরেকটি অত্যাবশ্যকীয় কাজ হচ্ছে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অনেক বেশী দরুদ প্রেরন করা। **আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা মুহাম্মাদীন ওয়া আলা আলে মোহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মোহাম্মাদীন ওয়া আলা আলে মোহাম্মাদীন কাবা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।** কেননা হযরত মোহাম্মদ (সা.) সেই সত্বা যিনি আকাশ এবং পৃথিবীতে সমস্ত নবীগনের এবং সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় এবং মর্যাদাবান।

এক জায়গায় তিনি বলেন, এক ব্যক্তি যিনি ওলীউল্লাহদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে, তিনি এক জাহাজে আরোহিত ছিলেন, সমুদ্রে তুফান আসে, জাহাজ নিমজ্জিত হওয়ার দারপ্রান্তে ছিল, তার দোয়ায় জাহাজকে রক্ষা করা হয়। সেই বুযর্গ ব্যক্তির দোয়ায়। দোয়ার সময় তার প্রতি এলহাম হয় যে, তোমার খাতিরে আমরা সবাইকে রক্ষা করেছি। এসব কথা কেবল মৌখিক জমা খরচে অর্জন হয় না, এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তিনি বলছেন যে, আমাদের পক্ষ থেকে এই নসীহতই থাকবে যে, নিজেকে উন্নত এবং উত্তম আদর্শে পরিণত করার চেষ্টায় রত থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত জীবন ফেরেশতার সদৃশ্য না হবে, কীভাবে বলা যেতে পারে যে কেউ পাক বা পবিত্র হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করছেন, বস্তুত দোয়ায় আল্লাহ্ তা'লা অসাধারণ শক্তি রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বারংবার এলহামের মাধ্যমে এটিই বলেছেন, যা কিছু হবে দোয়ার মাধ্যমেই হবে, আমাদের অস্ত্র দোয়াই, আর এছাড়া অন্য কোন অস্ত্র আমার কাছে নেই। আমরা লোক চক্ষুর আরালে যাকিছু চাই আল্লাহ্ তা'লা তা প্রকাশ করেন। আমাদের দৃষ্টিতে দোয়ার চেয়ে বড় কোন অস্ত্র নেই।

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (ওয়া ইয়াফ্ আলুনা মা ইউ'মারুন) অর্থাৎ তারা তাই করে যা তাদের নির্দেশ দেয়া হয়। নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থা তেমনি কর যেমনটি তোমরা অন্যদের নসীহত করে থাক।

তিনি (আ.) বলছেন, আমাদের অস্ত্র হচ্ছে দোয়া। তাই দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। তিনি বলছেন, 'মসীহ্ মওউদ' সম্পর্কে কোথাও লেখা নেই যে, তিনি তরবারী হাতে নিবেন আর এটিও লেখা নেই যে, তিনি যুদ্ধ করবেন। বরং এটি লেখা রয়েছে যে, ঈসার ফুতকারে কাফের মারা যাবে অর্থাৎ দোয়ার ভিত্তিতে সব কাজ তিনি সিদ্ধি করবেন। তিনি বলছেন, এ সব লক্ষ্য যা আমরা অর্জন করতে চাই কেবল দোয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হওয়া সম্ভব, দোয়ার মাঝে অসাধারণ শক্তি রয়েছে। তিনি আরো বলছেন, বলা হয় এক বাদশাহ ছিল, কোন দেশের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্যে বের হয়, পথে এক ফকির তার ঘোরার বাগডোর নিজের হাতে নিয়ে নেয় এবং বলে যে, সামনে অগ্রসর হয়ো না, নতুবা তোমার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধে লিপ্ত হব। বাদশাহ আশ্চর্য হয়ে যায় আর বলে যে, তুমি এক অসহায়, নি:স্ব, সহায় সম্বলহীন ফকির, তুমি কীভাবে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পার, ফকির উত্তর দেয়, আমি প্রভাতের দোয়ার অস্ত্রের মাধ্যমে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাযের দোয়ার মাধ্যমে যুদ্ধ করব। বাদশাহ বলে যে, আমি এর মোকাবেলা করতে পারব না, এটি বলে সে ফিরে যায়, তো দোয়ায় এত শক্তি রয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করছেন, বস্তুত দোয়ায় আল্লাহ্ তা'লা অসাধারণ শক্তি রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বারংবার এলহামের মাধ্যমে এটিই বলেছেন, যা কিছু হবে দোয়ার মাধ্যমেই হবে, আমাদের অস্ত্র দোয়াই, আর এছাড়া অন্য কোন অস্ত্র আমার কাছে নেই। আমরা লোক চক্ষুর আরালে যাকিছু চাই আল্লাহ্ তা'লা তা প্রকাশ করেন। আমাদের দৃষ্টিতে দোয়ার চেয়ে বড় কোন অস্ত্র নেই। সৌভাগ্যবান সে, যে এ কথাকে বুঝে আল্লাহ্ তা'লা এখন ধর্মকে কিভাবে উন্নতি দিতে চান। অতএব, যে অস্ত্র আল্লাহ্ তা'লা ধর্মের উন্নতির জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে দিয়েছেন সেই অস্ত্রই

তাঁর মান্যকারীদেরকে ব্যবহার করতে হবে। এই অস্ত্রই আমাদের ইনশাআল্লাহ্ সমস্যা থেকে বের করবে আর অন্য শত্রুদেরকেও ব্যর্থ ও বিফল মনরোথ করবে, সকল আহমদীদের এ দিকেই দৃষ্টি দেয়া উচিত।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) সারা জীবন সকল কাজ দোয়ার মাধ্যমেই করেছেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দোয়া করেছেন। হুযূর (সা.)-এর সকল সাফল্য দোয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। হিজরতের সময় নিজ-গৃহ থেকে বেড়িয়েছেন, কেউ দেখে নি। শত্রু অনেক চেষ্টা করেও হুযূর (সা.)-এর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি।

বলা হয় বদরের প্রান্তরে নাকি যুদ্ধ হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লার ৩১৩জন আশেক, প্রেমিক জয় লাভ করেছিল। তরবারির শক্তিতে বিজয় অর্জিত হয় নি, সম্ভব ছিল না। এই জয়ের জন্য আল্লাহ্ তাঁর ফেরেস্তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন। হুযূর (সা.) ফেরেস্তাদের সাহায্যে জয় লাভ করেছেন। বাহুবলে কোনদিন সম্ভব ছিল না এই বিজয় হযরত মুহাম্মদ সা. দোয়ার মাধ্যমে আদায় করেছিলেন। তাবুর ভিতরে আল্লাহ্‌র কাছে তিনি সিজদাবনত হয়ে ডুঁকরে ডুঁকরে কেঁদেছিলেন। আর বলেছিলেন 'ইন আহলাকতা হাজিহিল আসাবাতা আন তু'বাদা ফিল আরযে আবাদা' হে আল্লাহ্ আমি এই গুটি কতক মানুষ নিয়ে বদরের প্রান্তরে উপস্থিত হয়েছি। যদি আজকে তুমি এদেরকে ধ্বংস হতে দাও তাহলে বল অবশেষে তোমার ইবাদত করার মানুষ কে থাকবে? তোমার ইবাদতের দোহাই লাগে আমাদেরকে রক্ষা কর এবং বিজয় দান কর। আর এ বিজয় হয়েছে দোয়ার বিনিময়ে, অসাধারণ ঐশী-সাহায্যে। আল্লাহ্ তা'লা হুযূর (সা.)-এর পক্ষে অসাধারণ মোজেযা-শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.) বলেছিলেন হে আল্লাহ্‌র রসূল! যথেষ্ট হয়েছে, আপনি নিজের জন্য এত কষ্ট কেন বরণ করছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন এবং সিজদায় পড়েছিলেন এবং তার গায়ের কাপর বার বার ঝুলে পড়ে যাচ্ছিল, যতক্ষন পর্যন্ত তিনি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অঙ্গিকার না পেয়েছেন **'সাইউহজামুল জাম'উ ওয়া ইউ ওয়াল্লুনাদ্ দুবুর'** *(সূরা আল কমর: ৪৫)* ততক্ষন পর্যন্ত তিনি মাথা তুলেন নি। সমস্ত কাজ তিনি নামাযের মাধ্যমে দোয়া করে আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে আদায় করিয়ে নিয়েছেন।

তিনি (আ.) আরো বলেছেন, "যদি তোমরা চাও যে ভাল থাক এবং তোমাদের গৃহে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করুক, তাহলে অনেক দোয়া করতে থাক। তোমাদের ঘরগুলো দোয়া দিয়ে ভরে দাও। যে ঘরে সব সময় দোয়া হয়, আল্লাহ্ তা'লা সে ঘরকে ধ্বংশ করেন না।" *(মালফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃ: ২৩২)*

তিনি (আ.) বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'লা বার বার আমার প্রতি এলহাম করেছেন, 'উজিবু কুল্লা দোয়ায়েকা' আমি তোমার সকল দোয়া কবুল করব।'

তিনি (আ.) বলেছেন, 'স্মরণ রাখ, যতদিন তোমরা মুত্তাকী হবে না, ততদিন দোয়া কবুল হবে না।' *(মালফুযাত, ৫ম খন্ড, পৃ: ১৩০)*

মুত্তাকি হতে হলে প্রতিদিন তওবা করতে হয়, এস্তেগফার করতে হয়, আল্লাহ্‌র সাহায্য চাইতে হয়। আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত এটি সম্ভব নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাজার হাজার দোয়া কবুল হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, আমার হাজার হাজার দোয়া কবুল হয়েছে। যদি লিখতে বসি, তাহলে একটি বড় বই হবে।" *(হাকীকাতুল ওহী, পৃ:৩১১)*

হাজার হাজার আহমদী, গায়ের আহমদী, হিন্দু, মুসলমান প্রয়োজনের সময় এসে হুযূর (আ.)-কে দোয়ার অনুরোধ করেছে। হুযূর দোয়া করেছেন। তাদের কষ্ট দূর হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) অনেক সময় জুমআর খুতবায় সাহাবায়ে কেরামের ঘটনা শুনিয়ে থাকেন। এখানে আমি দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

হাকীকাতুল ওহী, তিরিয়াকুল কুলুব, নুযুলে মসীহ্, ইত্যাদি গ্রন্থে দোয়া কবুলের অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন মালির কোটলার রইছ সর্দার নওয়াব মুহাম্মদ আলী খাঁন সাহেবের পুত্র আব্দুর রহিম খাঁন একটি মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল প্রচন্ড জ্বর ছিল বাঁচার কোন লক্ষন দেখা যাচ্ছিল না এক প্রকার মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। সে সময় আমি তার জন্য দোয়া করলাম তখন আমার মনে হল যে এটি অটল তকদির। তখন আমি খোদা তা'লার নিকট নিবেদন করলাম যে, হে ইলাহী আমি তার জন্য শাফায়াত করছি। এর উত্তরে খোদাতালা বললেন- "মানযাল্লাযি ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বে ইযনিহি"। কার স্পর্ধা! যে সে খোদাতালার অনুমতি ব্যাতীত কারো জন্য শাফায়াত করতে পারে। হুযূর (আ.) নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। ভয় পেয়ে কেঁপে উঠলেন। তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। এর কিছুক্ষন পরেই এই ইলহাম হল যে, **"ইন্নাকা আনতাল মাযাজ"**। অর্থাৎ তোমাকে শাফায়াত করার অনুমতি দেয়া হল। তখন হুযূর (আ.) অনেক প্রাণবিগলিত চিত্তে দোয়া করলেন। তারপর দোয়া কবুল হোল। ছেলেটি আস্তে আস্তে সুস্থ্য হয়ে উঠল। *(হাকীকাতুল ওহী, পৃ: ২১৯)*

"হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিজ-সন্তান মোবারক আহমদ অসুস্থ্য হলেন। অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। বার বার জ্ঞান হারাচ্ছিলেন। হযরত (আ.) দোয়া করেই যাচ্ছিলেন। মহিলারা ছেলের পাশে বসে ছিলেন। এক সময় কোন মহিলা উচ্চ স্বরে বললেন, এখন শেষ কর, ছেলে তো মারা গেছে। তখন হযরত (আ.) দোয়া থেকে উঠে এসে ছেলের শরীরে হাত রাখলেন এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ধ্যান-নিবদ্ধ

করলেন, মনোযোগ দিলেন। ২/৩মিনিট পরে ছেলে আবার নি:শ্বাস নিতে শুরু করল। ছেলে জীবন লাভ করল।" *(হাকীকাতুল ওহী, পৃ: ২৫৩)*

মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, আমার পুত্র বশীর আহমদ চোখের রোগে এমন অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল যে, কোন ঔষধই কাজে আসছিল না আর অন্ধ হয়ে যাওয়ারও আশংকা ছিল। যখন রোগের আধিক্য চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গেল তখন আমি দোয়া করলাম। আমার উপর তখন ইলহাম হল **"বাররাকা তিফলী বাশির"** অর্থাৎ আমার পুত্র বশির দেখতে লাগল। তখন সেদিন বা পরের দিনেই সে আরোগ্য লাভ করল। এই ঘটনাও প্রায় একশ মানুষের জানা আছে।

হযরত মীর মাহ্দী হোসেন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হুযূর (আ.) আমাকে ডেকে নির্দেশ দেন, আমাদের অতিথিশালায় জ্বালানী নেই তুমি গ্রাম থেকে আগামী কালের জন্য জ্বালানী ক্রয় করে আজ সন্ধ্যার মধ্যে ফেরত আসবে, এ বলে তিনি আমাকে জ্বালানী ক্রয় করার জন্য চার টাকা প্রদান করেন। আমি দুই টাকা নিয়ে সোজা মসজিদে মুবারকের ছাদে চলে যাই। বর্তমান মিনার যা মসজিদ থেকে পৃথক দাঁড়িয়ে আছে এর পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করি হে প্রভু! তোমার মসীহ্ আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন যে সম্পর্কে আমার কোনই অভিজ্ঞতা নেই। আমাকে এমন এমন পথ বাতলে দেয়া হোক যেখান থেকে আমি সন্ধ্যার মধ্যে জ্বালানী নিয়ে ফেরত আসতে পারি। আমি মিনারের সামান্য উপর থেকে একটি ধ্বনী শুনতে পাই, আর আওয়াজটি ছিল "রেগেস্তান" অর্থাৎ মরুভূমি। আমি ভাবলাম আমার পায়ের ক্ষতের কারণে হয়তঃ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যেতে বারণ করেছেন। আমি পুনরায় নিবেদন করলাম– হে প্রভু! অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার নিকট আবেদন করেন, আমি খুড়িয়ে খুড়িয়েই চলে যাব। কিন্তু তোমার মসীহ্র নির্দেশ যেন সন্ধ্যার মধ্যে পালিত হয়। দ্বিতীয়বার উত্তর আসে এখানেই এসে যাবে। কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই। আমি কৃতজ্ঞতার সেজদা করলাম এবং বললাম, যদি এভাবেই মসীহ্র কাজ সম্পন্ন হয় তাহলে তো সমস্ত পৃথিবীর জয় হবে। আমি সেখানেই বসে পড়লাম এবং দোয়া করতে আরম্ভ করলাম হে আমার প্রভু! সন্ধ্যার সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট লজ্জিত যেন হতে না হয়। অতঃপর হৃদয়ে এই প্রশ্নের উদয় হল, আমি কোন নবী বা ওলী নই যার ইলহাম এত দ্রুত পূর্ণ হবে। বরং আমার কোথাও যাওয়া উচিত। পুনরায় মনে হল, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে দাওয়াত দেয় যে, রাতে আমাদের বাড়িতে খাবার খাবে তাহলে সে দ্বিধাদ্বন্দে লিপ্ত হয় না তাই আমারও খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতির প্রতি ভরসা করা উচিত। তিনি অবশ্যই এখানে জ্বালানী পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিবেন। আমি এতে প্রশান্ত হয়ে মসজিদের ছাদেই বসে থাকি। দুপুর ঘনিয়ে আসছিল। আমি নিচে নেমে আসতেই যে খাদেমার (আয়া) সামনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে জ্বালানী আনার জন্য টাকা দিয়েছিলেন সে আমাকে দেখে বলে, তুমি এখনো জ্বালানী আনতে যাও নি। আমি হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়ে মনে করলাম, সে যেহেতু হুযুরের নিকট অবস্থান করে তাই সে অবশ্যই জানে যে, হুযুরের উপর ইলহামও হয় আবার তা পূর্ণতাও যায়। আমি বললাম দুঃশ্চিন্তার কিছু নেই। খোদা তা'লা আমাকে ইলহাম দ্বারা জানিয়েছেন, জ্বালানী এখানেই পৌঁছে যাবে। এতে সে রাগান্বিত হয়ে বলল, তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রতি ইলহাম না হবে আমি কোথাও যাব না। দেখ! আমি এখনই হযরত সাহেবের নিকট গিয়ে বলছি। সে এ কথাকে অন্যভাবে নিয়েছে। তিনি বলেছিলেন, সেখানে পৌঁছে যাবে। সে অর্থ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইলহাম না হবে আমি কোথাও যাব না। আমি তাকে বাঁধা দেয়া সত্ত্বেও সে হুযূরকে গিয়ে বলে দেয় যে, সে বলছে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রতি ইলহাম না হবে আমি কোথাও যাব না। আমার দুঃশ্চিন্তা হল, এখন হুযূর আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন আর আমাকে নিজের ইলহামের বর্ণনা দিতে হবে। একজন ভিক্ষুক বাদশাহ্র সম্মুখে কীভাবে বলতে পারে যে, আমিও সম্পদশালী। {অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তো সবসময়ই ইলহাম হয়। আমি কীভাবে বলব যে, আমার প্রতিও ইলহাম হয়েছে।} এ কারণে আমি মসজিদের সিড়ি দিয়ে নেমে বাটালার দিকে যাবার দরজার পানে ছুটলাম। আর পিছন ফিরে দেখছিলাম কেউ আমাকে ডাকছে না তো। বাটালা যাবার দরজার নিকট পৌঁছে আমি স্থির করলাম সিখওয়া গিয়ে মৌলভী ইমাম উদ্দীন ও খায়র উদ্দীন সাহেবের সহযোগিতায় জ্বালানী খুঁজবো। কিছুদূর যাবার পর আমার পুনরায় মনে হল, খোদা তা'লা বলেছেন জ্বালানী এখানেই আসবে। যদি আমি বাহিরে চলে যাই তাহলে কীভাবে কাজ হবে কেননা টাকাও আমার কাছে। এ কারণে আমি পুনরায় ফেরত এসে মসজিদের ছাদে বসে দোয়া করতে থাকি– খোদার কৃত অঙ্গীকার যেন পূর্ণ হয়। হযরত আকদাসের পিরাঁ দিত্তা নামক একজন কর্মচারী যাকে পাহাড়ীয়া বলা হতো সে আমাকে দেখে ডাক দিয়ে বলল, বালান অর্থাৎ জ্বালানীর গাড়ি পাহাড়ী দরজার নিকট পৌঁছেছে তাড়াতাড়ি এসে কিনে নাও। আমি কৃতজ্ঞতামূলক সিজদা করে তার সাথে গিয়ে দেখি জ্বালানী বোঝাই একটি বাহন পাহাড়ী দরজায় এসেছে, গিয়ে দেখি একটি পুটলি ছিল গোবরের জ্বালানীর বাকী সব ছিল লাকড়ির আর তা ক্রয়ের জন্য ১২জন ক্রেতা একজন আরেকজনের তুলনায় দুই আনা দুই আনা করে বাড়িয়ে দর-দাম হাঁকছিল। এভাবে এক টাকা বার আনা পর্যন্ত মূল্য পৌঁছে যায়। নাজিম উদ্দীন সাহেব দুই টাকা দিয়ে নিতে চাইলেন। আমি হাঁক দিয়ে বললাম, আগে দেখে নেই এখানে কত টাকার জ্বালানী আছে। এরপর গাড়ির দিকে ফিরে বললাম এখানে এক টাকা বার আনার চেয়ে এক পয়সারও বেশী জ্বালানী নেই। এটি লাকড়ি গোবরের জ্বালানী নয়– যার খুশি সে কিনে নিক। এটা বলে আমি চলে আসলাম আর মনে মনে বললাম, হে প্রভু! তোমার অনুগ্রহ ছাড়া আমার পক্ষে এটি পাওয়া সম্ভব নয়। আমার চলে আসার পর একে একে সকল

ক্রেতা চলে যায় কেবল পিরাঁ দিত্তা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। এটি ক্রয় করার কেউ নেই দেখে লাকড়ীওয়ালা আশ্চর্য হয়। পিরাঁ দিত্তা তাকে বলল, গাড়ি নিয়ে আমার সাথে চল আমি তোমাকে এক টাকা বার আনায় কাঠ বিক্রি করে দিব। বাহক তার সাথে যখন আসলো তখন আমি মসজিদে মুবারকে দোয়ারত ছিলাম। শুনতে পেলাম পিরাঁ দিত্তা ডেকে বলছে, জ্বালানীর গাড়ি এসেছে এটি সামলাও। জ্বালানীর গাড়ি অতিথিশালায় পৌঁছে দিয়ে আমি মনে করলাম হযরত সাহেবকে অবহিত করি যে, আপনার নির্দেশ অনুসারে কাজ হয়ে গেছে। আবার ভাবলাম এই সামান্য কাজের জন্য কি আর সংবাদ দিব। আমার সংবাদ দেয়ার প্রয়োজন নেই। খোদা স্বয়ং হযরত সাহেবকে অবহিত করবেন। সকালবেলা হযরত আকদাস প্রাতঃভ্রমনে বের হন। খালের দিকে আমার পিতার প্রস্তুত করা রাস্তার পথে ফেরত আসার সময় কৌতুকের ছলে বলেন এখানে কি মেহেদি হাসান এসেছে? আমি তাকে জ্বালানী আনার জন্য বলেছিলাম, কিন্তু সে বলে যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি ইলহাম না হবে (যেভাবে সেই মহিলা গিয়ে শুনিয়েছে) আমি এ কাজ করতে যাব না। এ ঘটনা শুনে উপস্থিত সবাই হেসে উঠেন। কিন্তু যাহোক আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার দেখুন! তার (অর্থাৎ মেহেদী হাসানের) কিছু অপরাগতা ছিল আর আল্লাহ্ তা'লাও স্বীয় অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়ার ছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে তার দোয়া কবুল হয়েছে এবং সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) দোয়ার কবুলিয়াতই যে, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, "হে খোদা লাভে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! তোমরা এই প্রস্রবনের দিকে ধাবিত হও, এটি তোমাদেরকে প্লাবিত করে দিবে। এটি জীবনের উৎস, এটি তোমাদেরকে বাঁচাবে। আমি কি করব এবং কোন উপায়ে এই সংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করে দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করবার জন্য কোন জয় ঢাক দিয়ে আমি বাজারে- বন্দরে ঘোষনা করব যে, ইনিই তোমাদের খোদা এবং আমি কি ঔষধ প্রয়োগ করব যাতে শ্রবনের জন্য তাদের কান উন্মুক্ত হয়?"

একটি জামে দোয়া যা এ যুগের মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) সমগ্র পৃথিবীবাসির জন্য বিশেষভাবে উম্মতে মুসলেমার জন্য হৃদয় নিগরানো দোয়া করেছেন তা হচ্ছে-

"হে আমার আল্লাহ্! আমার জাতির ক্ষেত্রে আমার দোয়া এবং আমার ভাইদের ক্ষেত্রে আমার আহাজারী শ্রবণ কর, আমি তোমার নবী খাতামান নবীঈন এবং পাপীদের শাফায়াতকারী, যার শাফায়াত গ্রহণ করা হবে এর বরাতে তোমার কাছে মিনতি করছি। হে আল্লাহ্! তুমি অন্ধকার থেকে তাদেরকে তোমার আলোর দিকে নিয়ে আন এবং দূরুত্বের মরু থেকে তোমার দরবারে উপস্থিত কর। হে আল্লাহ্! তাদের প্রতি কৃপা কর, যারা আমাকে অভিশাপ দেয় এবং যারা আমার হাত কাটে, এই জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা কর, হেদায়াত তাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট কর। তাদের ভুল ভ্রান্তি এবং পাপ মার্জনা কর, তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের সংশোধন কর এবং তাদেরকে পবিত্র কর এবং তাদের এমন চোখ দান কর যার মাধ্যমে তাদের জন্য দেখা সম্ভব হয়, এমন কান দাও যার মাধ্যমে তারা শুনতে পায় আর এমন হৃদয় দাও যার মাধ্যমে তারা বুঝতে পারে আর এমন জ্যোতি দান কর যার মাধ্যমে তারা বুঝে উঠতে পারবে, তাদের প্রতি করুনা কর, তারা যা কিছু বলে তা ক্ষমা কর, কেননা, তারা এমন জাতি যারা জানে না। হে আমার প্রভু! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এবং তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার দোহাই এবং তাদের দোহাই যারা রাতের বেলায় দণ্ডায়মান হয় এবং প্রভাতে যুদ্ধ করে এবং সেই সকল বাহনের দোহাই যারা রাতে প্রবল বেগে ধাবিত হয়, সেইসব সফরের কসম যা মক্কা মুকার্‌রমাকে সামনে রেখে করা হয়, আমাদের এবং আমাদের ভাইদের মাঝে মীমাংসার উপকরণ সৃষ্টি কর, তাদের দৃষ্টি উন্মোচন কর, তাদের হৃদয়কে আলোকিত কর, তাদেরকে তা বুঝাও যা তুমি আমাকে বুঝিয়েছ এবং তাদেরকে তাকওয়ার রীতি নীতি শেখাও আর যা কিছু পূর্বে ঘটেছে তা মার্জনা কর। আমাদের চূড়ান্ত এবং শেষ মিনতি হল সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সুউচ্চ আকাশের লালন এবং পালনকারী।"

আমি আমার লেখায় হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ছোট দোয়া উল্লেখ করছি- যা তিনি ১৮৮৯ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন আমি আল্লাহ্‌র নিকট এই দোয়াই করি-**"আল্লাহুম্মারদা আন্নী রিদায়ান লা সাখাত্বা বা'দাহু ওয়াগফিরলী মাগফিরাতান লা আখযা বা'দাহা"**

অনুবাদঃ হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার প্রতি এরুপ সন্তুষ্ট হয়ে যাও যে, এরপর আর কখনো আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইও না। তুমি আমাকে এমনভাবে ক্ষমা কর এরপর আর কখনো আমাকে পাকড়াও করো না।

প্রিয় পাঠক, সবশেষে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষায় আকুতি নিবেদন করেই আমার লেখার ইতি টানছি- 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে দেখছ, আমি কেমন অন্ধ এবং দৃষ্টিশক্তি বঞ্চিত আর আমি এখন একেবারে মৃত অবস্থায় আছি। আমি জানি কিছুক্ষণ পরই আমার ডাক আসবে আর আমাকে তোমার দিকেই চলে যেতে হবে তখন আমাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু আমার হৃদয় অন্ধ এবং শক্তিহীন। তুমি আমার হৃদয়ে নূরের এমন আগুণ অবতীর্ণ কর যেন তোমার ভালোবাসা এবং তোমার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায়। তুমি আমার প্রতি এমন কৃপা কর যেন আমি অন্ধ হয়ে তোমার সামনে উপস্থিত না হই এবং অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তি বঞ্চিতদের অর্ন্তভুক্ত যেন না হই।'

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা

মাওলানা সাব্বির আহমদ, মুরুব্বি সিলসিলাহ্

মুহাম্মদ জো হামারা পেশওয়া হে
হো উস কে নাম পার কুরবান সাব কুছ
উসি সে মেরী দিল পা তা হে তাসকিন
খোদা কো উস সে মিল কার হাম নে পায়া

মুহাম্মদ (সা.), আমাদের নেতা
তাঁর নামে সমস্ত কিছু উৎসর্গিত হোক
তাঁর মাধ্যমেই আমার মন প্রশান্তি লাভ করে
তাঁর সুবাদেই আমরা আল্লাহ্‌কে পেয়েছি

মুহাম্মদ জো কে মাহমুদে খুদা হে।
কে ওহ শাহানশাহ হার দুসরা হো॥
ওহী আরাম মেরী রুহ কা হে।
ওহী ইক রাহ দী- কা রাহনুমা হো॥

মুহাম্মদ (সা.), আল্লাহ্ তা'লার প্রেমাস্পদ।
কেননা তিনি উভয় জগতের রাজাধিরাজ।
তিনিই আমার আত্মার শীতলতা।
তিনিই ধর্মজগতের দিশারী।

মহানবী (সা.) খাতামান্ নাবিয়্যীন

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সবচেয়ে বড় শান ও মর্যাদা হল তিনি খাতামান্ নাবিয়্যীন। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো– **"মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকির রাসুলাল্লাহি ওয়া খাতামান্ নাবিয়্যীন। ওয়া কানাল্লাহু বিকুল্লি শায়ইন আলীমা।"** *(সূরা আহযাব ৪১)*

আহলে সুন্নাত এর দেওবন্দি আলেম মাহমুদুল হাসান সাহেব এই আয়াতের অর্থ করেছেন, "মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের পুরুষদের মাঝে কারো পিতা নন, কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীগণের মোহর। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী।" আমরা আহমদীরাও খোদা তা'লার এই উক্তিতে পূর্ণভাবে বিশ্বাসী।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর খাতামান্ নাবিয়্যীন উপাধির অতুলনীয় শান ও মর্যাদার বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক ও দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। তবে সর্বসম্মত মতে এই আয়াতের যে অর্থগুলো দাঁড়ায় তার প্রত্যেকটি মহানবী (সা.)-এর মর্যাদাকে সমুন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে আর আয়াতের শানে নুযুল দেখলে এখানে খাতামান্ নাবিয়্যীন এর অর্থ যুগের দিক দিয়ে শেষ নবী করা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হয় না, বরং এখানে এমন কোন অর্থ হবে যাতে মহানবী (সা.)-এর শান ও মর্যাদা প্রকাশ পায়।

● প্রখ্যাত সুফি হযরত আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন আলি হুসাইন আল হাকিম আত তিরমিযি 'খাতামুল আউলিয়ার' ৩৪১ পৃষ্ঠায় এ বিষয়টি এভাবে লিখেন: "এই ধারণা করা যে, খাতামান্ নাবিয়্যীন এর অর্থ হল, তিনি প্রেরিত হওয়ার দিক দিয়ে শেষ নবী, এতে তাঁর কি ফযীলত ও শান প্রকাশ পায়? আর এতে কোন্ জ্ঞানের কথা উল্লেখ আছে? এই অর্থ তো স্বল্প জ্ঞান ও স্বল্প বুদ্ধির লোকেরা করে থাকে।"

● দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) লিখেন: "জনসাধারণের ধারণায় রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর খাতাম হওয়ার অর্থ হল, তাঁর যুগ পূর্ববর্তী নবীদের যুগের পরে এবং তিনি সবার শেষ নবী। কিন্তু জ্ঞানীরা অবগত আছেন, যুগের দিক দিয়ে পূর্ববর্তী বা পরবর্তীতে আগমনের মাঝে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।" *(তাহযীরুন্নাস, পৃষ্ঠা-৩)*

অতএব মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক বিবেচনা করে মুহাম্মদ (সা.) এর খাতামান্ নাবিয়্যীন হওয়ার যে সমস্ত অর্থ দাঁড়ায় তা হল:

প্রথমত: হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবীগণের মোহর। অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর সত্যায়ন ছাড়া অন্য কোন নবীর সত্যতা সাব্যস্ত হতে পারে না। পূর্ববর্তী সকল নবীর নবুয়্যত মহানবী (সা.)-এর সত্যায়ন ও স্বাক্ষ্য দ্বারা সত্য সাব্যস্ত হয় এবং তাঁদের প্রতি যে সমস্ত মিথ্যা কল্প কাহিনী বা অপবাদ লেপন করা হয় সেগুলোকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) খণ্ডন করে তাঁদেরকে নিষ্পাপ ও পবিত্র নবী হিসেবে প্রমাণিত করেছেন।

দ্বিতীয়ত: মহানবী (সা.) সকল নবীর মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা মহীয়ান ও পূর্ণতম

নবী, যিনি সকল নবীর গৌরব ও অলংকারস্বরূপ এবং মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ বা সর্বশেষ মার্গে অধিষ্ঠিত।

যিন্দেগী বাখ্‌শ জামে আহমদ হে
কিয়া হি পিয়ারা ইয়ে নাম আহমদ হে
লাখ হো আম্বিয়া মাগার বাখুদা
সাব সে বার কার মাকামে আহমাদ হে

জীবনদায়ী পেয়ালাখানি নাম তাঁর আহমদ
কত না প্রিয় এই নাম আহমদ (সা.)
লাখো আম্বিয়া আছেন, কিন্তু খোদার কসম!
মুহাম্মদ (সা.)-এর পদমর্যাদা সর্বোচ্চ॥

তৃতীয়তঃ মহানবী (সা.) শরীয়তবাহী নবীগণের মাঝে সর্বশেষ অর্থাৎ, তাঁর মাধ্যমে সেই শরীয়তের যা আদম (আ.) থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ক্রমাগত উন্নতি করছিল তা পরিপূর্ণতা পেয়েছে। সূরা আল মায়েদার ৪নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দি'নাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি।** আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামতকে তোমাদের উপর পূর্ণ করলাম।

কুরআন করীম, হাদিস এবং ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবুয়্যত তিন প্রকার।

প্রথমতঃ শরীয়তবাহী স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নবুয়্যত। যে নবীর উপর নতুন শরীয়ত নাযিল হয় এবং যার মাধ্যমে এক নতুন যুগ ও নতুন ধারার সূচনা হয় কিন্তু যিনি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হয়ে থাকেন। যেমন হযরত মূসা **(আ.), হযরত মুহাম্মদ (সা.)।**

দ্বিতীয়তঃ শরীয়তবিহীন স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নবুয়্যত। যে নবীর উপর কোন নতুন শরীয়ত নাযিল হয় না, কিন্ত তার নবুয়্যত পূর্ববর্তী নবীর অনুসরণ ছাড়াই সরাসরি খোদার পক্ষ থেকে লাভ হয়। আর এ কারণে তাঁকে স্বাধীন নবীও বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ হযরত মূসা (আ.)-এর পর হযরত দাউদ (আ.), হযরত সোলায়মান (আ.), হযরত ঈসা (আ.)। তাঁরা সকলে মূসা (আ.)-এর শরীয়তের অধীন ছিলেন এবং তওরাতের সেবকও ছিলেন, কিন্তু মূসা (আ.)-এর অনুসরণের ফলে তাঁরা নবুয়্যত লাভ করেন নি। বরং স্বাধীনভাবে নিজ গুণে তাঁরা নবুয়্যত লাভ করেছিলেন।

তৃতীয়তঃ শরীয়তবিহীন অধিনস্ত বা পরাধীন নবুয়্যত। এ ধরণের নবীর কোন নতুন শরীয়তও থাকে না আর স্বাধীনভাবে নিজ গুণে সরাসরি এই নবুয়্যত লাভ করা যায় না। বরং পূববর্তী নবীর অনুসরণে এবং তাঁর কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত হয়ে এই নবুয়্যত লাভ হয়ে থাকে। একে উম্মতি নবী বা যিল্লি নবী বা প্রতিচ্ছায়া নবীও বলা হয়।

এখানে সবচেয়ে মজার বিষয় হল, আল্লাহ্ তা'লা কেবলমাত্র আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্তায় এ মর্যাদা নির্ধারণ করেছেন যে, তাঁর অনুসরণে, তাঁর আনুগত্যে এবং তাঁর কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত হয়ে কোন ব্যক্তি নবুয়্যতের অর্থাৎ, উম্মতি নবী বা যিল্লি নবীর পুরস্কারে ভুষিত হতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করে বলেন, **ওয়া মাইয়্যুতিইল্লাহা ওয়ার রাসুলা ফাউলাইকা মা'আল্লাযিনা আন'আমাল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়্যিনা ওয়াস সিদ্দিকিনা ওয়াশ শুহাদাই ওয়াস সালিহিন। ওয়া হাসুনা উলাইকি রাফিকা।** অর্থ: আর যে আল্লাহ্ ও এই রসুলের আনুগত্য করবে এরাই তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের আল্লাহ্ পুরস্কার দান করেছেন। অর্থাৎ, তারা নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহদের অন্তর্ভুক্ত হবেন আর তারাই সঙ্গী হিসেবে উত্তম। *(সূরা নিসা ৭০)*

যেরুপভাবে হযরত আবু বকর, হযরত আয়েশা (রা.) সিদ্দিকিয়্যাতের পুরস্কার লাভ করেছেন, অসংখ্য সাহাবা শহীদ হবার মর্যাদা লাভ করেছেন, উম্মতে মুহাম্মদিয়ার পুণ্যবান ব্যক্তিগণ সালেহ হয়েছেন। তদ্রুপভাবে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) শুধুমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণে ও আনুগত্যে উম্মতি নবুয়্যতের পুরস্কার লাভ করেছেন।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) নিজে এ কথার স্বীকারোক্তি দিয়ে বলেন,

উস নুর পার ম্যা ফিদা হু।
উস কা হি ম্যা হুয়া হু।
ওহ হ্যা ম্যা চিয কিয়া হু।
বাস ফায়সালা এহী হ্যা।

অর্থ: এই আলোর তরে আমি উৎসর্গিত,
আমি তো হয়েছি তারই।

তিনিই সব -আমি কিছুই না, ফয়সালা আমার এটাই॥... (চলবে)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর শেষ হয়ে গিয়েছে। গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী রয়ে গিয়েছে। ইতোমধ্যে নতুন অর্থ বছর শুরু হয়েছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরীয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।
মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, ০১৯১২৭২৪৭৬৯
ওয়াসসালাম

খাকসার

সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুর-এর ১৩ তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৯ অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে গত ২১ ও ২২ নভেম্বর, ২০১৯ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুরের ১৩তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব মোকাররম আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী সাহেব, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ সভাপতিত্বে এই ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ মোহাম্মদ আবুল খায়ের সাহেব। উদ্বোধনী অধিবেশনে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন স্থানীয় যয়ীমে আলা, আবু জাকির আহমদ সাহেব। নযম পাঠ করেন জনাব মামুনুল হক। উদ্বোধনী অধিবেশনের তরবীয়তী সভায় নসিহতমুলক বক্তব্য পেশ করেন মোহতরম মাওলানা আলহাজ্জ আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে উপস্থিত সকলকে নসিহত করেন এবং সামাজিক ব্যাধি ও অবক্ষয় থেকে মুক্ত থাকার জন্য ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা নিজ গৃহে অনুশীলনের আহ্বান জানান। তিনি নিয়মিতভাবে দোয়া করা এবং যুগ-খলীফার (আই.) সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক তাঁর তরবীয়তী বক্তব্যে সকলেই মোহিত হয়েছেন। কর্মব্যাস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও ৩০ জন নও-মোবাঈন এবং স্থানীয় সদস্য ও মেহমানসহ ১৪০ জন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসেবে নায়েব সদরবৃন্দ, কায়েদ উমুমী,

ঢাকা রিজিওনাল ও জেলা নাযেমে আলা সাহেবান অংশগ্রহণ করেন।

ইজতেমার হাজিরা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় প্রতিটি আনসার সদস্যদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করা হয়েছে। এছাড়াও ইজতেমার সিলেবাস ও অনুষ্ঠান সূচী ফটোকপি করে সদস্যদের নিকট পৌঁছানো হয়েছে। ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্যে নও-মোবাইনদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে ও অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। অর্থসহ নামায শিক্ষা প্রতিযোগীতাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও ৩০ জন আনসার সদস্য বা-জামাত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেছেন।

২২ নভেম্বর, শুক্রবার বিকাল ৪টায় সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র প্রতিনিধি মোকাররম মোহাম্মদ গোলাম কাদের সাহেবের সভাপতিত্বে এই ইজতেমার সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অধিবেশনে মোন্তাযীম উমুমী, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সাহেব মজলিস আনসারুল্লাহ্, মিরপুরের বার্ষিক রিপোর্ট ২০১৯ পেশ করেন। ইজতেমায় ১৩ টি তালিমী ও খেলাধূলা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়াও তবলীগ, তরবিয়ত নও মোবাঈন ও ইশার বিভাগের উত্তম কর্মীদেরও পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০১৯ কার্য সালের শ্রেষ্ট ও উত্তম হালকাসমূহের নাম ঘোষণা করা হয়। আহমদনগর হালকার যয়ীম ইউসুফ আহমদ সাহেবের হাতে শ্রেষ্ট হালকার ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়াও কাজীপাড়াও মোকামী হালকাকে উত্তম ঘোষণা করা হয় ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। আহাদপাঠ ও দোয়ার পর সভাপতি সাহেব ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

-মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, মিরপুর

Hakim Water Technology & Filter House

Helpline: 01711 33 89 89, Tell: +88-02-7540545

E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

OUR SERVICES:

Drinking Water Plant, ETP, STP, DMP, Swimming Pool Plant, Iron Removal, Juice Processing Plant, Soft Drink Plant, Indoor Fishing, Chemicals ETC.

VISIT OUR PAGE & LIKE:

/hakimengineering | /hakimwatertechnology | /hakimindoorfishfarming /hakimwatertechnology

সংবাদ

সংকলন: মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

মিরপুর জামা'তের সিরাতুন্নবী (সা.) সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২রা নভেম্বর, ২০১৯ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুরের উদ্যোগে **"সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা ও তবলীগি প্রশ্নোত্তর পর্ব"** মিরপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। মাগরীব ও এশার নামায পর সভার কাজ শুরু হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুরের আমীর মোকাররম আলহাজ্ব মোহাম্মদ গোলাম কাদের সাহেব। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ আবুল খায়ের সাহেব। **"মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম জীবন আদর্শ"** বিষয়ে বক্তৃতা করেন মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলাহ। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করেন ও আগত জেরে তবলীগ মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মাওলানা রাসেল সরকার সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলাহ।

সিরাতুন্নবী (সা.) সেমিনারে এমটিএ-তে সরাসরি সম্প্রচারিত **'সত্যের সন্ধানে'** প্রোগ্রাম দেখানো হয়। সেমিনার রাত ১০ ঘটিকা পর্যন্ত ব্যাপী চলে। সেমিনারে ৭০ জন মেহমান (জেরে তবলীগ)-সহ ১৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল।

আবু জাকির আহমদ,
সেক্রেটারি, তবলীগ ও তরবীয়ত নও-মোবাঈন

চট্টগ্রাম জামা'তের উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৯/১১/২০১৯ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা মসজিদ "বায়তুল বাসেত" মসজিদ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত ও নযম পরিবেশনের মাধ্যমে এ মহতি জলসার শুভ সূচনা হয়। এতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের সম্মানিত আমীর মোহতারম মোর্শেদ আলম সাহেব সভাপতিত্ব করেন। এ সিরাতুন্নবী (সা.) জলসায় চট্টগ্রাম জামাতের বহু সংখ্যক আহমদী সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উক্ত জলসায় বক্তব্য রাখেন মুরুব্বি সিলসিলা জনাব জাফর আহমদ সাহেব, মোয়াল্লেম

জনাব রাজু সাহেব, জনাব হাসেম সাহেব ও জনাব শাহাবুদ্দিন সাহেব প্রমুখ। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ শামশুদ্দীন হেলাল
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম

চান্দপুর চা বাগান জামা'তের উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৫/১১/২০১৯ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চান্দপুর চা বাগানের উদ্যোগে বায়তুস সামী মসজিদে বাদ জুমুআ সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মাহমুদ আহমদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদুল হাসান চৌধুরী এবং নযম পরিবেশন করেন জনাব ছারোয়ার হোসেন চৌধুরী। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মাহমুদুল হাসান চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। অনুষ্ঠানের শেষ দিকে জনাব এহসানুল হাবীব (জয়) তার সুললিত কণ্ঠে একটি উর্দু নযম শোনান। সবশেষে সভাপতি সাহেব দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ১৩ জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিতি সবার জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা ছিল।

মাহমুদুল হাসান চৌধুরী

মাহিল্যা জামা'তের উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৫/১০/২০১৯ তারিখ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মাহিল্যার হালকা ইয়ারং ছড়ির উঁচু টিলায় অবস্থিত মসজিদে মহান সিরাতুন্নবী (সা.) আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, প্রেসিডেন্ট মাহিল্যার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন শরিফুল ইসলাম। বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব আব্দুর রহিম ও জনাব আব্দুর রশিদ। পরবর্তীতে নবী করীম (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ শওকত হোসেন, শিক্ষক মাহিল্যা আহমদীয়া স্কুল মৌলভী মোহাম্মদ যিকরে এলাহী, ও মৌলভী মুহাম্মদ আমীর হোসেন মোয়াল্লেম ওয়াক্‌ফে জাদীদগণ। অত:পর সভাপতির সাহেব ভাষণ ও দোয়া শেষে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৩৩ জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। ঐদিন দুপুরে খাবারেরও ব্যবস্থা ছিল।

গত ০৮/১১/২০১৯ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মাহিল্যা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা কর্তৃক আয়োজিত সিরাতুন্নবী (সা.) আলোচনা সভা স্থানীয় মসজিদ **"বায়তুর রহমানে"** জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মাহবুব আহমদ এবং বাংলা ও উর্দু নযম পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব মোহাম্মদ ওমর আলী, জনাব মাবরুর আহমদ খাদেম চিটাগাং। এরপর নবী করীম (সা.)-এর সিরাতের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল খালেক, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও যয়ীম, মৌলভী মোহাম্মদ যিকরে এলাহী, মোয়াল্লেম, মৌলভী মুহাম্মদ আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ এবং মাওলানা জাফর আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ চট্টগ্রাম। পরিশেষে সভাপতি সাহেব সমাপনী বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত ঘোষণা করেন। উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম হতে ২ জন লাজনা ও ৩ জন পুরুষসহ মোট ১১০ জন উপস্থিত ছিলেন। যার মাঝে ১৮ জন নও মোবাঈন ও ০৫ জন মেহমান ছিল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জনাব মোহাম্মদ মোহসেন উদ্দীন মিলন, জেনারেল সেক্রেটারী, প্রধান শিক্ষক মাহিল্যা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের জন্য দুপুরের খাবার ব্যবস্থা ছিল।

***মুহাম্মদ আমীর হোসেন,** মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ*
মাহিল্যা, রাঙ্গামাটি

মহারাজপুর জামা'তের উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ৬ ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার বাদ জুমাআ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলাম মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ গাজী মনসূর আহমদ, উর্দু নযম পরিবেশন করেন নাজিয়া সরকার। নবী জীবনের উপর ঈমান বর্ধক ও প্রাণসঞ্চারী বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে এনামূল হক সরকার, হাফেজ গাজী মনসূর আহমদ, আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া প্রমুখ। পরে সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে আপ্যায়ন

করা হয়। জলসায় আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা, নাসেরাত মিলে সর্বমোট ৩০ জন উপস্থিত ছিল। জলসায় নও মোবাইন সহ আহমদী শিথিল ভাইদেরকেও জলসায় অংশগ্রহণের জন্য দাওয়াত দেয়া হয়।

নজরুল ইসলাম মোল্লা, প্রেসিডেন্ট

নাসেরাবাদ জামা'তের উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২২/১১/২০১৯ তারিখ রোজ শুক্রবার জামাতের নিজস্ব মসজিদে সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ জুমুআ অত্র জামাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব শওকত আলী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মুহাম্মদ ইয়াদ এবং নযম পরিবেশন করেন জনাব মিজানুর রহমান। এ মহতী অনুষ্ঠানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সিরাতের ওপর বক্তৃতা করেন জনাব ইমন আলী, বিজয় আহমদ, আসাদুজ্জামান, বিমন হোসেন, মিজানুর রহমান মিজান, আব্দুর রহমান, মজিবর রহমান, আরিফ আহমদ সুমন প্রেসিডেন্ট, মনিরুজ্জামান ভূইয়া (মোয়াল্লেম)। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সাদেক জেনালের সেক্রেটারী। এ অনুষ্ঠানে ১৫ জন লাজনাসহ মোট ৫২ জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

আরিফ আহমদ (সুমন), প্রেসিডেন্ট

সৈয়দপুর জামা'তের শুক্রবার হতে লঙ্গরখানা চালু করা হয়

প্রায়শঃই দূর-দূরান্ত হালকা হতে সৈয়দপুর জামা'তের সদস্য ও নও-মোবাঈনগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সৈয়দপুরে প্রত্যেক শুক্রবার জুমুআর নামায আদায় ও নানা প্রয়োজনীয় কাজে এসে থাকেন। এমতাবস্থায় দুপুরের খাবার খাওয়াটা সবার

জন্যই জরুরী হয়ে পড়ে। আশেপাশে কোন বাজার-হোটেল নেই ফলে আমাদেরকে বিব্রত পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। এই অসুবিধার কথা বিবেচনা করে জামাতের আমেলার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অত্র সৈয়দপুর জামা'তের সদস্যগণের একান্ত উৎসাহে ২২/১১/২০১৯ তারিখ রোজ শুক্রবার হতে লঙ্গরখানা চালু করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ্ ॥

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে জনাব শাহ গিয়াস উদ্দিন সাহেব, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সৈয়দপুর এই লঙ্গরখানার শুভ উদ্বোধন করেন। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা শরীফ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্। সকলের নিকট সৈয়দপুর জামা'ত এবং লঙ্গরখানা চলমান রাখার কামনায় বন্ধুদের নিকট বিনীত দোয়ার আবেদন করছি।

সৈয়দ আহমদ দেওয়ান, জেনারেল সেক্রেটারী

কোড্ডা জামাতে তালিম ও তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১৬/১১/২০১৯ রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কোড্ডার উদ্যোগে মসজিদ পাড়া হালকায় জনাব সালেহ আহমদ ভূইয়া সাহেবের বাসায়, জনাব মোস্তাক আহমদ ভূইয়া সাহেবের সভাপতিত্বে তালিম তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন মোসাম্মৎ শেফালী আক্তার ও তাবাছছম মীরা। সভায় তালিম তরবিয়ত সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন জনাব শরীফ আহমদ চৌধুরী, জনাব এনামুল হক (ইন্টু), জনাব আব্দুল হাকীম মোয়াল্লেম। সবশেষে সভাপতি সাহেবের মূল্যবান বক্তব্য প্রদান দোয়া ও চা চক্রের পর সভার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সভায় ৭ জন জেরে তবলীগসহ মোট ৬৫ জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

এনামুল হক (ইন্টু), জেনারেল সেক্রেটারী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সিঙ্গাপুর
৩২তম সালানা জলসা-২০১৯'এ অংশগ্রহণকারীদের একটি গ্রুপ ফটো

সরকারী ব্যবস্থাপনায় "বিজয় ফুল" রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ

আমার মেয়ে নিশাত তাসনীম মুনা নাসেরাতুল আহমদীয়া ধানীখোলা। সে ধানীখোলা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৭ম শ্রেণিতে অধ্যয়ণরতা। গত অক্টোবর ২০১৯ হতে সরকারীভাবে স্কুল পর্যায়ে "বিজয় ফুল" প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। মেয়ে মুনা মুক্তি যোদ্ধা বিষয়ে স্কুল পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে। সে এ বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে যথাক্রমে থানা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আলহামদুলিল্লাহ্। অত:পর সে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। উক্ত প্রতিযোগিতা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ্। আমার মেয়ে যেন জাতীয় পর্যায়ে ভাল ফলাফল করতে পারে তার জন্য জামাতের সকলের কাছে দোয়ার আবেদন রইলো। সে যেন জামাতের বেশি বেশি সেবা দান করে জামাতের একজন উত্তম সেবিকা হতে পারে তার জন্যও দোয়া করতে বিনীত আরজ রইল।

মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, *মোয়াল্লেম , ধানীখোলা*

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের প্রাক্তন গেটম্যান জনাব মুহাম্মদ ছিদ্দিক মোড়ল পিতা: মৃত- আবু দাউদ মোড়ল। মরহুম সাতক্ষীরা জামাতের সদস্য ছিলেন। তিনি গত ০৭/১২/২০১৯ রোজ শনিবার সকাল ১০.৩০ মিনিটে হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) । মরহুম জামাতের কল্যাণে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি আদর্শ দায়ী ইলাল্লাহ্ ও তবলীগ পাগলা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাতক্ষীরায় বসবাসরত গয়ের আহমদীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রীসহ ১ মেয়ে অনেক আত্মীয় স্বজন ও শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন। দয়াময় আল্লাহ্ তা'লা যেন মরহুমের বিদেহী আত্মাকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং পরিবারের সবাইকে নিরাপদের রাখেন সেজন্য জামাতের সকল ভ্রাতাভগ্নির নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন (বুলু)
পাথরঘাটা, সাতক্ষীরা

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক হতে পবিত্র থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোকনা কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।

৩

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, প্রত্যহ আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করায় মনোনিবেশ করবে। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা ও বড়াই করবে।

৪

উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬

সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

৭

অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

১০

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে, জগতের কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মাঝে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

(মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯)

New Vol. No. 82 | 11th Issue

The Fortnightly Ahmadi
Since 1922

15th December, 2019 | Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগেই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

Printed and Published by **Alhaj Mahbub Hossain M.A.** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)